হিরণ্যগর্ভ
নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১লা বৈশাখ, ১৪২৩

Hiranyagarbha
Volume 9, No. 1
हिरण्यगर्भ
नबम वर्ष, प्रथम संख्या
तारिख-१५एप्रिल,२०१६

১লা বৈশাখ, ১৪২৩ 15th April, 2016

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	07
	রাজা সত্রাজিৎ কন্যা দেবী সত্যভামা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	09
	সূর্য্যবংশীয় নৃপতি সত্যবিক্রম	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	10
	নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা	শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর	11
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	13
	হেমকুণ্ডের পথে	শ্রীসৌরভ বসু	14
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	15
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	16
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	19
	যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব	অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায়	20
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	21
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী		22
	গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ	শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য	23
হিন্দী বিভাগঃ—	कृपासिंधु महर्षि देवराहा बाबा	श्रीविमलानन्द	26
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	28
	राजा सत्राजित्कन्या देवी सत्यभामा	श्रीमती ज्योति पारेख	29
	गुरुगीता	श्रीश्रीमा सर्वाणी	31
	परमब्रह्म के साक्षी	श्रीविमलानन्द	32
	हेमकुण्ड की ओर	श्रीमती ज्योति पारेख	32
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	34
	नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला	श्रीमती सुशीला सेठिया	35
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	37
	सूर्यवंशीय नृपति सत्यविक्रम	श्रीमती ज्योति पारेख	39
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	40
English Section ः—			
	Kripasindhu Brahmarshi Devraha Baba	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	45
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	46
	What is LIFE?	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	47
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	51
	My Life With Anirvan	Sri Gautam Dharmapal	53

ISBN No. 978-93-80373-86-7 Cover : Sri Sri Devraha Baba

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

বসন্তের স্নিগ্ধ সমীরণ আন্দোলিত, পুষ্পভারাবনত বৃক্ষরাজি ও শাল-পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার রক্তিমতা মাখা দোলযাত্রা ও বসন্তোৎসব সদ্য অতিক্রান্ত। শিবরাত্রির মহাতিথিতে আমরা স্মরণ-বন্দনা করেছি পরমকল্যাণময় বিশ্বেশ্বর, সদাশিব ও পরমশিবের। শেষ বসন্তের পাতাঝরা উদাসী হাওয়া বহন করে আনে পরম পুণ্যময় বাসন্তিক নবরাত্রি উৎসব, যেদিন আমরা আশ্রম প্রাঙ্গণে ভক্তিবিনম্র চিত্তে আরাধনা করব অন্নপূর্ণামাকে—যিনি পরম ভক্তবৎসলা, মনোবাঞ্ছাপূরণকারিণী, জ্ঞান-বৈরাগ্য-সিদ্ধিদাত্রী মহাশক্তি। সেই পরমলগ্নের পরেই আমরা বরণ করে নেব আরও একটি নববর্ষকে আর পুনঃ সঙ্কল্প গ্রহণ করব আধ্যাত্মিক ভাবধারায় আত্মবিনিয়োগ করবার নিমিত্ত। শ্রীশ্রীমায়ের অনুকম্পায় ও তাঁর পুণ্য আধ্যাত্মিক উপস্থিতিতে পরম পুণ্যবান গুরুভাইগণ অবলোকন করে এলেন দুই পুরাণ- প্রাচীন ভগবৎবেত্তা ব্রহ্মস্বরূপ মহাত্মার তপোস্থলি—ব্রহ্মর্ষি দেওরাহাবাবার পদধূলিধন্য বিন্ধ্যাচল আশ্রম, অপরটি স্নিগ্ধ-সলীলা কালিন্দী নদীর তীরবর্ত্তী গোস্বামী তুলসীদাসজীর জন্মস্থলী। শ্রীশ্রীমার আত্মজ্ঞানের আত্মজ্যোতির প্রভায়, তাঁর অনুকম্পায় আমরা জ্ঞাত হই এই দুই অবতার-বরিষ্ঠ ব্রহ্মবেত্তা পুরুষের আদি সত্তার পরিচয়। গোস্বামী তুলসীদাসজী পুরাণপুরুষ বশিষ্ঠদেব, যুগে যুগে অনন্য ভগবৎলীলা সংঘটক ঋষি—ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের লীলা সংঘটক মহাপুরুষ। ব্রহ্মর্ষি দেওরাহাবাবা স্বয়ং ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি সনক। এই দিব্যপুরুষ ঋষিই ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠদেবের তপোপ্রবাহে ত্রেতাযুগে ভগবান শ্রীশ্রীনারায়ণের পূর্ণকলা আবেশ অবতার শ্রীশ্রীরামচন্দ্ররূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের সাথে তাঁর কালোত্তীর্ণ নিবিড় আধ্যাত্মিক যোগ।

আজ নববর্ষের পুণ্য তিথিতে, আনন্দঘন চিত্তে, আমরা প্রণতঃ হই এই দুই মহাত্মনের পাদপীঠে ও তাঁদের জ্যোতির্ময় চরণকমলে ঐকান্তিক প্রার্থনা জানাই যেন তাঁদের পরম অনুকম্পায়, শ্রীশ্রীবাবা ও শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদে আমাদের অন্তর্জগত আলোকিত হয়—আমারা যেন শুদ্ধ চিত্তে সততঃ তাঁদের চরণ বন্দনায় আত্মনিবেদন করতে পারি। শুভ নববর্ষে সকল গুরুমহারাজদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

The days of Holi and the festival of colours have just receded into the past. The landscape is ablaze with riotous colours of spring flowers in bloom. A few days back, we celebrated Shivaratri festival with piety and verve when the Ashramites paid obeisance to Lord Shiva through puja and hawan. Spring brings with it the Navratri festival, another auspicious event, when we worship the Ashram's presiding deity Sree Sree Annapurna Mata – the supreme Mother Goddess who incessantly blesses us through Her compassion and sows the seeds of wisdom, penance and emancipation amongst Her devotees.

As the spring ushers in the Bengali New Year (1423), we would celebrate the joyous moment, like every year, with religious fervor and renew our vow for dedicating ourselves in pursuit of spirituality. With the holy Grace of Sree Sree Maa and amidst Her divine presence, some of our blessed Gurubhais paid a visit to the holy lands of Brahmarshi Devraha Baba and Goswami Tulshidasji, two of the greatest spiritual doyens of ancient India. While the Vindyachal Ashram of Deoraha Baba was blessed by the holy footprints of the great saint, Goswami Tulshidasji graced the banks of River Kalindi (Yamuna), near Chitrakoot Dham, through his holy birth. As learnt from Sree Sree Maa, Tulshidasji was none other than the great sage Vashishtha who, in Treta Yuga, invoked the Divine incarnation of Lord Vishnu in the embodiment of Shri Shri Ram through His penance. Devraha Baba was the great sage Sanaka, the son of Brahma, through whom the divine deeds of Shri Shri Ram were orchestrated. He bears a deep-rooted spiritual link with Sree Sree Maa through the ages.

On the auspicious occasion of Bengali New Year, we bow in obeisance to the lotus feet of these two great sages and beseech their blessings for our spiritual journey forward. We pay our devout homage to Shri Shri Baba, Sree Sree Maa and all Guru Maharajas on this pious occasion.

কৃপাসিন্ধু ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

উত্তরভারতে তীর্থ পরিক্রমা করাকালীন একটি প্রবাদ কথা বহুস্থানেই শোনা গিয়াছে যে বাল্মিকী মুনিই পরবর্তীকালে গোস্বামী তুলসীদাসজী রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। আবার ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবার ক্ষেত্রেও অনেকের মত যে তিনিই সাক্ষাৎ বাল্মিকী। কিন্তু আত্মজ্ঞানের আত্মজ্যোতির প্রভায় পরমবোধের দ্বারা এবং সাধনকালে প্রত্যক্ষ অনুভূত ঘটনার সম্মুখীন হইয়া অবগত হইলাম যে গোস্বামী তুলসীদাসজী ও ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবা একই ব্যক্তিত্ব নহেন। আর বাল্মিকী মুনিও অন্য স্বতন্ত্র এক মহান ব্যক্তিত্ব। সদ্‌গুরু পরম্পরার দিব্য আলোকে জ্ঞাত হই যে গোস্বামী তুলসীদাসজী ছিলেন ব্রহ্মর্ষি 'বশিষ্ঠদেব', যিনি পুরাণকালের এক বিশেষ অমর চরিত্র এবং একজন অনন্য ভগবৎলীলা সংঘটক ঋষি, যিনি 'যোগবাশিষ্ঠ' রামায়ণের মুখ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। অন্যদিকে ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবার পূত সান্নিধ্যে এবং তাঁহার দৈবকৃপাবলে অবগত হইয়াছিলাম যে শ্রীদেবরাহা বাবা হইলেন একজন প্রাচীন দিব্যপুরুষ ব্রহ্মার মানসপুত্র ব্রহ্মর্ষি 'সনক'; এই ব্রহ্মা পুত্র সনক ঋষিই বশিষ্ঠদেবের তপোপ্রভাবে ভগবৎ রামলীলায় ভগবন্ নারায়ণের পূর্ণ কলায় পরিপূর্ণের পরিপূর্ণ আবেশ অবতার স্বরূপে শ্রীরামচন্দ্ররূপে ধরায় অবতীর্ণ হইয়া ভগবৎলীলায় অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবা হইলেন 'জগন্নাথ' তত্ত্বাধিকারী একজন বিরাট মহাত্মা। এতদ্‌ব্যতীত প্রজ্ঞার আলোকে জানা গিয়াছে যে মহর্ষি বাল্মিকী হইলেন প্রাচীন কালের 'মেধাতিথি' ঋষি, যাঁহার যজ্ঞকুণ্ড হইতে এক দিব্যাণী আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মেধাতিথি সেই দিব্য কন্যার নাম দিয়াছিলেন 'অরুন্ধতী' এবং মেধাতিথির এই কন্যা অরুন্ধতীর সঙ্গে ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠের বিবাহ হয়।

ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রীদেবরাহা বাবা

সাক্ষাৎ শ্রীরামস্বরূপ ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবার কথা লিখিতে বসিয়া আমার জীবনে তাঁহাকে প্রথম যেমনভাবে প্রত্যক্ষ দর্শনে উপলব্ধি করিয়াছিলাম সেই বৃত্তান্তই এই স্থলে ব্যক্ত করিতেছি — তখন ইং ১৯৮৭ সাল; আমি সদ্য সল্টলেকের বাসায় আসিয়াছি। ঠাকুরের আসনও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সময় একজন দরিদ্র মজদুর মুসলমান মেয়ে, নাম হালিমা বিবি, আমায় সেবা করিতে আসিত। একদা আমি যখন সকালে আসনে ঁশ্রীশ্রীআদ্যামায়ের পূজা করিতেছি সে সময় সে অপূর্ব কিছু সহস্রমুখী জবা পুষ্প লইয়া আমার কাছে আসিয়া বলিল যে ঁমায়ের পূজার জন্যে সে ঐ পুষ্পগুলি চয়ন করিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম যে ফুলগুলি অতীব তাজা এবং সুন্দরভাবে ধৌত করা। আমি কিছু না ভাবিয়াই, আত্মস্থভাবে পূজারত অবস্থায় তাহার হাত হইতে নিজের হাতে পুষ্পগুলি লইলাম। তারপর ঁআদ্যা মায়ের পূজা করিলাম। কয়েকদিন পর আমার পেটে অসহনীয় যন্ত্রণা শুরু হইল। তখনও বুঝিতে পারি নাই যে ঐ মুসলমান নারীর নিদারুণ পেটের ব্যাধি আমার মধ্যে সংক্রামিত হইয়াছে। পূর্বে কখনো কখনো সে আসিয়া পেটের যন্ত্রণার জন্যে আমার নিকটে ঔষধ চাহিত ও বেশ কিছুদিন করিয়া অসুস্থ থাকিত। সে গরীব, খেটে খাওয়া মানুষ; তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। আমি মনে মনে তাহার জন্যে দুঃখবোধ করিতাম। কিন্তু এই নিদারুণ ব্যাধি যে কখনো আমার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া যাইতে পারে তাহা কখনো ভাবি নাই। পূজাকালে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি ঊর্ধ্বগামী করিয়া লইতে হয়। সেই অবস্থায় কেহ দেহ স্পর্শ করিলে সাধকের দুর্ভোগ অনিবার্য্য। আমার ক্ষেত্রেও হইল তাই। তখন রোগে ভোগা ছাড়া আর কোন উপায় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই আমি শয্যায় শায়িত হইলাম। শরীরের দুর্বলতা ও পেটে যন্ত্রণা এবং তাহার সঙ্গে রক্তশূন্যতা। সারাদিন শুইয়া থাকি আর সদ্‌গুরুকে স্মরণ করি। ডাক্তারী চিকিৎসায় যখন বিশেষ কোন ফল হইল না তখন জপ আর গুরু পরমগুরু ভরসা বিনা আর অন্য কি উপায়? এই অবস্থায় একদা রাত্রে এক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিল। — আমি জপরত অবস্থায় নিমীলিত নেত্রে অবস্থান করিতেছিলাম। এমন সময় হঠাৎ গুরুগম্ভীর ''হুম্-

ম্-ম্'' নিনাদ্ শুনিতে পাইলাম। ক্রমশঃ সেই নিনাদ আরও জোরদার হইতে লাগিল এবং আমার কক্ষে যেন ভূকম্পনের মত অনুভব হইল। সেই মুহূর্তে কে যেন আমার অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দিল এবং আমি দর্শন করিলাম — আমার মস্তকের দিকে দেওয়ালে একটি কালো গোলাকৃতি ক্ষুদ্রবিন্দু যেন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে একটি সুগভীর গুফার আকার নিল। সেই গুফার অভ্যন্তর হইতে ''হুম্-ম্-ম্'' শব্দে ওঙ্কার ধ্বনি যতই জোরদার হইতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিলাম যে গুফার ভিতরে একজন বৃহদাকৃতি সম্পন্ন মানুষ ক্রমশঃ ঘরের দিকে আসিতেছে। মুহূর্ত মধ্যেই সেই মানব গুহা হইতে নির্গত হইয়া আমার কক্ষে আমার আসনের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। প্রথমেই আমাকে হস্ত উন্মীলন পূর্বক আশীর্বাদ করিলেন এবং পরে বলিলেন —''মৈঁ বহুত দূর সে তুম্হারে পাস আয়া হুঁ; মেরা সময় বহুত্ কম হৈ। তুম্হে জগত্ হিত্ কে লিয়ে কুছদিন রহনা পড়েগা। কুছ সময় বাদ শীঘ্র মৈঁ বৃন্দাবন মেঁ শরীর ত্যাগুঁঙ্গা; অব্ মৈঁ সরযূ কে কিনারে রহুঁঙ্গাঁ। সোচ বিচার করতে হুয়ে মনুষ্যোঁ কী ভোগ কা গ্রহণ করনা পড়তা হৈ। এ্যায়সা কভী ন করনা।'' তারপরে, ''রাম'' মন্ত্র কর্ণে প্রদান করিলেন। মন্ত্রের শব্দে আমার দেহে পরাচৈতন্যের স্পন্দন স্পন্দিত হইয়া উঠিল। আমি মুগ্ধ নেত্রে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তারপর সেই মহাত্মা উঠিলেন এবং সপ্তবার আমায় প্রদক্ষিণ করিয়া আবার গুহার অভ্যন্তর দিয়া ওঙ্কার দিতে দিতে চলিয়া গেলেন। ওঙ্কার ধ্বনি হইতে ''রাম'' শব্দ নির্গত হইয়া সমগ্র বায়ুমণ্ডলে ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

ইহার পর সমগ্র রাত্রি আমি কেমন ভাবে অবস্থান করিয়াছিলাম স্মরণে নাই। সকালে নিদ্রাভঙ্গ হইতেই সেই মহামানবের চেহারা আমার মানস নেত্রে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল এবং কে যেন আমার অন্তরের মধ্যে বলিয়া উঠিল, ''ব্রহ্মবেত্তা দেবরাহা বাবা আসিয়াছিলেন, তুমি এখন তাঁর কৃপায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবে।'' সত্যই সেই দিন হইতে অত্যাশ্চর্য্যভাবে আমার রোগের উপশম হইয়া গেল এবং আমি আবার পূর্বাপর খাওয়া-দাওয়া করিয়া দু-চার দিনের মধ্যেই ভাল হইয়া উঠিলাম।

ইহার পর একদা বাবাজী মহাশয় (শ্রী সরোজ লাহিড়ী বাবাকে আমি ঐ নামে সম্বোধন করিতাম) আসিলে তাঁহাকে সকল ঘটনা বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন যে, ''তোমার সঙ্গে দেবরাহা বাবার এক গভীর সম্পর্ক রহিয়াছে তা তুমি পরবর্তীকালে জানিতে পারিবে।'' সেইদিন রাত্রিকালে সমগ্ররাত্রি ব্যাপী একটিই চিন্তা আমার মধ্যে হইতে লাগিল যে আমার সঙ্গে তাঁহার কি এমন গভীর সম্বন্ধ যে এ জীবনে যাহাকে স্মরণ করি নাই, অথচ তিনি আমার কাছে আবির্ভূত হইলেন কেন!

তৎপরে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেবরাহা বাবাকে দর্শন করিতে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে বারাণসী গেলাম। শুনিয়া ছিলাম যে তখন দেবরাহা বাবা রামগড়ে গঙ্গার তীরে মাচায় থাকিতেন। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সঙ্গে সেই যাত্রা সাক্ষাৎ হইল না। সেইদিন অঝোর ধারায় বর্ষণ হইতেছিল আর সেই কারণে আমরা কেহই হোটেলের বাহিরে যাইতে পারি নাই। রাত্রে ঘুমাইয়া ছিলাম স্বপ্নের মত দেখিলাম — দেবরাহা বাবা বলিতেছেন -''তুম্হারে সাথ মেরা সাক্ষাৎ নহীঁ হোগা। মৈঁ সরযূকে কিনারে আ গয়া হুঁ। ছহ্ মহিনে বাদ বৃন্দাবনে মেঁ শরীর ছোড়ুঙ্গা।'' স্বপ্নেই তাঁহাকে দর্শনকালে আমার মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল যে তাঁহার সঙ্গে আমার কিসের গভীর সম্পর্ক? এই সময় আমার স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল।

ইহার বেশ কিছুদিন পর আমি পর্ণশ্রীতে আসি। তখন একদা দুপুর বেলায় ধ্যান সাধনা করিতেছি, এমন সময় কূটস্থের গগন মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া ওঙ্কার ধ্বনি হইতে লাগিল এবং লক্ষ্য করিলাম, সেই আকাশের আলোর মধ্যে একজন অতি প্রাচীন ঋষিবর আবির্ভূত হইলেন। আকাশবক্ষে তাঁহার দেহের উপরিঅংশ শুধু দেখা যাইতেছিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার মনে প্রশ্ন জাগিল,''তুমি কে?'' তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলিলেন, ''ব্রহ্মাপুত্র সনক''। তারপর সেই ঋষি সনকের অবয়ব জ্যোতির্ময় হইয়া জ্যোতিতে পরিণত হইয়া গেল এবং উহার পরিবর্তে সেই জ্যোতির মধ্যে ব্রহ্মর্ষি দেবরাহা বাবা এবং পরে কৈবল্যনাথ শ্রীশ্রীরামঠাকুর মহাশয়ের অবয়ব ফুটিয়া উঠিয়াই আবার সনক ঋষিতে পরিণত হইয়া গেল। তিনি মানস তরঙ্গের দ্বারা বলিলেন, ''আমি সর্বদাই তোমার সঙ্গে থাকি ও থাকব। নির্ভয়ে থাকো, জগতের জন্যে তোমার অনেক কাজ।'' ওঙ্কার ধ্বনি ক্রমশঃ দূরে চলিয়া যাইতে লাগিল আর কূটস্থমধ্যে যেন নিঃস্তব্ধ এক প্রশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। সম্বোধিতে জানিলাম সেই ধ্রুব সত্য —''ভগবৎ স্বরূপের পথে 'ব্রহ্মর্ষি সনক' শ্রীশ্রীরামলীলায় ভগবান রামের ভূমিকায় ভগবান শ্রীহরি

নারায়ণের পূর্ণদ্বাদশ কলা সমুদ্ভূত পূর্ণ আবেশ অবতার বরিষ্ঠ রূপে এই ধরাতলে অবতীর্ণ হন সনাতন ধর্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠার্থ'' — এই তথ্য জ্ঞাত হইবার পর উপলব্ধি করিলাম — ''আমার সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্কের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য্য।'' কৃপাসিন্ধু শ্রীবন্ধু অবতার কল্প ব্রহ্মবেত্তা হইতে ব্রহ্মসত্তায় রূপান্তরিত হইয়াছিলেন শ্রীরামলীলায় অংশগ্রহণের পরে। তাঁহার বিষয় অবগত হইয়া মনে প্রাণে নিজেকে ধন্য মনে করিলাম আর বারংবার তাঁহার প্রতি প্রণাম জানাইলাম।

''শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম''

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (২৩) : আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীবাবা যে ত্রিকালদর্শী ছিলেন অর্থাৎ অতীতে যা হয়ে গেছে বা বর্তমানে যা হতে চলেছে এবং ভবিষ্যতে যা হবে তা বাবার চোখের সামনে 'Micro-film'-এর মত উদ্ভাসিত হতে থাকত। অনেক ঘটনার মধ্যে এই ত্রিকালদর্শীতার একটি ঘটনা এখানে তুলে ধরছি। —

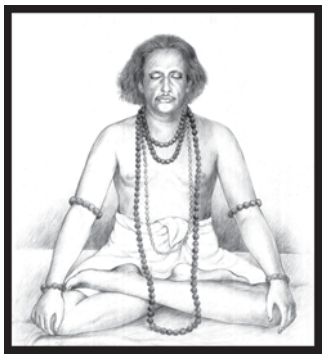
শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

কোনও একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমরা ক'জন বাবার নিকট বসে আছি, এমন সময় হঠাৎ বাপিদা (শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়), শ্রীশ্রীবাবার খুব কাছের ক্রিয়ান্বিত সন্তান, বাবাকে প্রণাম করে বলল, ''দাদা, আগামীকাল আমি পণ্ডীচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যাচ্ছি; আশীর্বাদ করুন যেন ভালভাবে থাকতে পারি।'' বাবা কম্পিত হস্তে আশীর্বাদ করতে করতে বললেন যে, ''তোর ওখানে চারদিনের বেশী থাকা হবে না। চারদিনের মাথায় তোর বাড়ী থেকে তার যাবে; পরের দিনই তোকে ফিরতে হবে। তবে তোর ফিরতে কোন অসুবিধা হবে না।'' একথা শুনে বাপিদা শুধু বলল যে, ''আপনি তো সঙ্গে আছেন, আমার চিন্তা কিসের?'' — এই বলে বাপিদা বাড়ী চলে গেল। এবার এর পরবর্তী ঘটনা বাপিদার মুখ থেকেই শোনা যাক। —

''আমি তো ভাল ভাবেই ট্রেনে করে সেখানে পৌঁছলাম এবং প্রথম তিন দিন আশ্রমের মধ্যে একটি কটেজে থেকে রোজ ঋষি-অরবিন্দের সমাধিভবনে যেতাম এবং সেই ভবনের দোতলায় বিশেষ অনুমতি নিয়ে প্রাণ ভরে ধ্যান করতাম এবং তার সঙ্গে অন্তর্মুখীন ক্রিয়াদিও করতাম। তাছাড়া সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াই এবং সব সময় মনের মধ্যে একটা ধ্যান-ভাবে ডুবে থাকি। ঠিক চারদিনের মাথায় বিকেলবেলাতে বাড়ী থেকে একটা তার এল বিশেষ কারণে আমার ফেরার জন্যে। আসলে তখনও তো আমি 'কাঁচা আমি', 'পাকা আমি'-তে পরিণত হইনি। যাইহোক, আমি ১৫ দিনের জন্যে এসেছিলাম সেই ভাবে আমার ফেরবার টিকিট কাটা ছিল। সুতরাং পরের দিনই সকালে তড়িঘড়ি স্টেশনেতে যাই এবং টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে তখন একটি বিরাট সমস্যা হয়। তখন আমি যদি গুরুদেবের কথার উপর আস্থা রাখতে পারতাম তাহলে সেই সময় প্রচণ্ড দৌড়ঝাঁপ অথবা টেনশন্ আমায় করতে হোত না। হঠাৎ স্টেশনেতে এক ভদ্রলোক আমার সাথেই যেচে আলাপ করলেন এবং জানতে পারলাম ভদ্রলোকও তাঁর আর এক বন্ধু মিলে দুটি টিকিট কেটে ছিলেন (two-tier reserved ticket); ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের গন্তব্যস্থল ছিল ভুবনেশ্বর, কিন্তু পারিবারিক অসুবিধার জন্যে বন্ধুটি আসতে পারেন নি। সুতরাং গুরুদেবের নাম স্মরণ করে অচেনা ভদ্রলোকের সেই বন্ধুর নাম নিজে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ি। ভদ্রলোকের নাম সম্ভবতঃ 'মনোজ পাণ্ডে' ছিল। আমাদের করমণ্ডল সুপার এক্সপ্রেস সকাল ৮-৩০ মিনিটে ছাড়লো। সেই ভদ্রলোকের শুধু যে সঙ্গ পেলাম তাই নয়, সারা ট্রেন-জার্নিতে আমাকে সেবা-যত্ন করে গেলেন তিনি। কত কি নিরামিষ খাদ্য খাওয়ালেন এবং মজার মজার গল্প বললেন। ট্রেনটি দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ছিল বলে মাত্র তিনটি স্টপেজ ছিল — সম্ভবতঃ সেন্ট্রাল মাদ্রাস, বিজওয়াড়া, ওয়ালটেয়ার এবং ভুবনেশ্বর। ট্রেনটি হাওড়াগামী ছিল এবং ভদ্রলোকই T.T-কে বলে আমার টিকিট হওড়া অবধি করে দিলেন কিছু টাকার বিনিময়ে। তারপর রাত্রি ১২টায় ট্রেনটি ভুবনেশ্বরে এসে পৌঁছলে পরে তখন ভদ্রলোক আমাকে অনেক ধন্যবাদ

দিয়ে নেমে যান। আমি কৃতজ্ঞতাবশতঃ ভদ্রলোকের লাগেজ্ নিজে বয়ে নিয়ে গিয়ে স্টেশন প্ল্যাটফর্মেতে নামিয়ে দিই। তারপর সেই extension ticket নিয়ে হাওড়ার দিকে রওনা হই। পরের দিন যখন ১২-৩০ নাগাদ সাঁতরাগাছি স্টেশন আসার আগেই অর্থাৎ বাগনান স্টেশনের কাছ থেকেই গুরুদেবকে জপ করে বলতে লাগলাম যাতে ট্রেনটি সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে কয়েক মিনিটের জন্য থেমে যায়, কারণ বাড়ী থেকে তার আসায় আমার মন খুব চঞ্চল হয়েছিল, আর তখন এখনকার মত মোবাইল ফোনের ব্যাপার ছিল না; যাই হোক গুরুদেবের ইচ্ছায় হাঠাৎ সাঁতরাগাছি স্টেশনে এসে ট্রেনটি থেমে যায়! কারণ জানা গেল যে 'সাময়িক ইঞ্জিনের ত্রুটির জন্য'; এদিকে আমি সঙ্গে সঙ্গে আমার ব্যাগ এবং লাগেজ্ নিয়ে নেমে পড়ি এবং যখন রিক্সাতে চেপে বাড়ীর দিকে রওনা হই তখন অদ্ভুতভাবে আবার ট্রেনটি স্টার্ট হয়ে যায়।

আমি সন্ধ্যাবেলা গুরুদেবের কাছে যেতেই বাবা বলে উঠলেন, ''বাপি সারাদিন ধরে আশ্রমে ধ্যান এবং ক্রিয়া করেছে, এইরকম ক্রিয়ান্বিত ছেলে যা চিন্তা করবে তাই হবে — হতেই হবে।''

প্রসঙ্গ (২৪) : গুরুভাই আশীষদা (শ্রীআশীষ ব্যানার্জী) তখন retired bank (Canara Bank) employee এবং একজন ভাল ক্রিয়ান্বিত। আমি লাহিড়ীবাবার নিকট যাওয়ার আগে থেকেই আশীষদার গুরু মহারাজের নিকট যাতায়াত ছিল এবং ঠিক সময় বার করে নিয়ে দুবেলাই দেখা করতে যেতো। আমি জানি যে বহুবার সকালে ব্যাঙ্কে যাওয়ার আগে রাস্তায় পাম্পকলের জল আনতে যাওয়ার ছুতো করে অন্ততঃ আধঘন্টার জন্যে আশীষদা শ্রীশ্রীবাবার কাছে চলে যেতো। এইরকম ছুতো করার কারণ, আশীষদার নিজের বাবা খুব রাশভারী এবং রাগী মানুষ ছিলেন। ওনার ধারণা ছিল যে ওটা একটা তান্ত্রিকের জায়গা। সেইজন্যে সব সময় তিনি যেতে বাধা দিতেন। এখনও আশীষদা শ্রীশ্রীবাবার ভাবে আত্মস্থ হয়ে থাকে এবং বাবার কথা বলতে গেলে কেমন যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এক অপূর্ব আনন্দ তার শরীরের মধ্যে খেলে যায়। এই আশীষদা বাবার প্রতিমুহূর্তে অনেক ঘটনার সাক্ষী। এখন কিছু ঘটনার কথা আশীষদার মুখ থেকেই শোনা যাক —

অহংকার শূন্য হয়ে মানুষকে শ্রদ্ধা করা —

প্রত্যেক দিনের মত কোন এক রবিবার আমি (আশীষ ব্যানার্জী), অসীমদা এবং আরও কয়েকজন আমরা দাদার (শ্রীশ্রীবাবা) সামনে বসে আছি। দাদা সামনেই খাটের উপর ভাবস্থ হয়ে গল্প করছেন। সেই সময় দাদার বাড়ীর সামনে একটি প্রাইভেট কার্ এসে থামল — সেখান থেকে একজন গৌরবর্ণ ভদ্রলোক (প্রায় ৭০ বৎসর বয়স হবে) নামলেন এবং তাঁর সাথে ড্রাইভার 'মতিলাল', সে দাদার পরিচিত এবং দাদার কাছে মাঝে মধ্যেই আসতো, তারা দুজনে এসে দাদার কাছে বসলো। দাদা ভদ্রলোকের কুশল সংবাদ নিলেন তারপর আরও কিছু কথা বলতে লাগলেন। দাদা লক্ষ্য করছিলেন যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঠিক বাবু হয়ে (cross-sit position) বসতে পারছিলেন না সম্ভবতঃ ব্যথার জন্যে। কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে চেষ্টা করে যাচ্ছেন বাবু হয়ে বসার, তবুও তার পা ছড়িয়ে যাচ্ছিল। এই দেখে দাদা তখন পরম স্নেহভরে বললেন, ''দাদা, পা-টা তুলে বাবু হয়ে বসার চেষ্টা করুন, আমি বলছি আপনি পারবেন।'' সেই ভদ্রলোক দাদার কথা শুনে সাহস পেয়ে চেষ্টা করতে লাগলেন কিন্তু পা-টা পজিশন্ মত নিয়ে যেতে পারছিলেন না। হঠাৎ মতিলাল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এবং প্রায় ধমকের সুরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে বলে উঠল, ''এই সামান্য জিনিসটা পারছেন না? এই দেখুন আমি যেভাবে করছি, আপনি ঠিক সেইভাবে করবেন,'' বলে ড্রাইভার মতিলাল ভদ্রলোকের মত পা ছড়িয়ে পা-টা তুলবার চেষ্টা করলো বাবু হয়ে বসবার জন্যে, কিন্তু সে কিছুতেই ডান পা-টা অন্য পায়ের উপর স্থাপন করতে পারল না! বেশ কয়েকবার সে চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুতেই পা-টাকে মেঝে থেকে সঠিক জায়গায় তুলতে পারলো না। যেন মনে হলো তার পা-টা কেউ আঠা দিয়ে শক্ত করে মেঝের সঙ্গে আটকে রেখেছে। মতিলালের মুখ-চোখ লজ্জায় লাল হয়ে গেল এবং তখন আমি (আশীষ) এবং অসীমদা ব্যাপারটা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পেরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি, দেখি — মতিলালের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। দাদা নির্বিকার হয়ে উদাসভাবে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কয়েক মিনিট বাদে দাদা মতিলাল ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে বললেন, ''মানুষকে সম্মান এবং শ্রদ্ধা করাটাই হচ্ছে সত্যিকারের মানুষের পরিচয়।'' *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

রাজা সত্রাজিৎ কন্যা দেবী সত্যভামা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

পুরাকালে দেবশর্মা নামে এক তপঃপ্রদীপ্ত বেদজ্ঞ মহর্ষি ছিলেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। তাঁহার স্ত্রীর নাম ছিল রুচি। দেবরাজ ইন্দ্র এই রূপবতী রুচির প্রতি অভিলাষী হইলে দেবশর্মার শিষ্য 'বিপুল' তাঁহাকে বাধা প্রদান করেন এবং দেবশর্মা ইন্দ্রকে অভিশাপ প্রদান করেন। সেই অভিশাপের ফলে পরবর্তীকালে ইন্দ্র কৃষ্ণহস্তে পরাজিত হন। এই মুনিসত্তম দেবশর্মার 'গুণবতী' নামক এক কন্যা ছিল। দেবশর্মা স্বীয় শিষ্য চন্দ্রের সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। একদা দেবশর্মা ও চন্দ্র বনে কুশ-কাষ্ঠ আহরণার্থ গমন করিয়া রাক্ষস হস্তে নিহত হন। গুণবতী একাদশী ও কার্ত্তিকে পুণ্যক ব্রত পালন করিয়া যথাকালে প্রাণত্যাগ পূর্বক পরজন্মে 'সত্যভামা' রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধর্মপত্নী হন। 'সত্যভামা' নামের তাৎপর্য হইল, যে ভামিনী সত্যকে অবলম্বন করিয়াছেন। সত্যকে অবলম্বন করিলে সত্যস্বরূপকে প্রাপ্তি হয়। ইনি সেই সত্য অবলম্বনকারী নারীর সাক্ষাৎ রূপ। সত্যভামা পরম সত্য স্বরূপ ব্রত অবলম্বন করিয়া ভগবানকে পতি রূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

একবার নারদ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিবার কালে স্বর্গ হইতে কল্পবৃক্ষের কয়েকটি পুষ্প সঙ্গে লইয়া আগমন করেন। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাতে তিনি ঐ পুষ্পগুলি শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেগুলি তাঁহার মহিষীগণের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। কিন্তু ভ্রমবশতঃ তিনি সত্যভামাকে কিছুই প্রদান করেন নাই। ইহাতে সত্যভামার মনে মনে খুব অভিমান হয়। পরে নিজভ্রম বুঝিতে পারিয়া শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার অভিমান নাশের জন্য গরুড়ে আরোহন পূর্বক দেবপুরে গমন করেন এবং তথা হইতে বলপূর্বক কল্পবৃক্ষ দ্বারকায় আনয়ন করিয়া সত্যভামার গৃহ-প্রাঙ্গণে রোপন করেন। সত্যভামা ঐ কল্পবৃক্ষ প্রাপ্ত হইয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং কি প্রকারে প্রতিজন্মেই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পতি এবং কল্পবৃক্ষ লাভ করিতে পারা যায় নারদকে সেই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ তখন তাঁহাকে বলিলেন যে তুলাপুরুষ দান করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে। সত্যভামা তাহা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যথা বিধি কল্পবৃক্ষ সহ তোলিত করিয়া নারদকে প্রদান করিলেন এবং তৎপরে তাঁহার আসন্ন বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া মনেপ্রাণে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তুলসীপত্রের বিনিময়ে নারদের নিকট হইতে তিনি পুনঃ স্বামীকে ফিরিয়া পান। নারদ তখন কল্পবৃক্ষ লইয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন। অতঃপর একদিন সত্যভামা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে কি কারণে তিনি ঐরূপ সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত কীর্তন করেন।

সত্যভামা রাজা সত্রাজিতের কন্যা ছিলেন। সত্রাজিৎ শিনির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিঘ্নের পুত্র ও একজন যদুবংশীয় রাজা ছিলেন। সত্রাজিৎ সূর্য্যের উপাসক ছিলেন এবং সূর্য্যের সহিত অতিশয় প্রীতি থাকাতে সূর্য্যদেব প্রণয় চিহ্ন স্বরূপ 'স্যমন্তক মণি' সত্রাজিৎকে প্রদান করেন। সেই অত্যুৎকৃষ্ট মণি হইতে সুবর্ণ উৎপন্ন হইত এবং তাহার প্রভাবে অনাবৃষ্টি হইত না এবং দেশে ব্যাধিভয়ও ছিল না। সত্রাজিৎ পুর্বজন্মে অত্রিবংশীয় একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তখন তাহার নাম ছিল 'দেবশর্মা'।

রাজা সত্রাজিৎ তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রসেনজিৎকে এই অমূল্য মণি দান করেন। সত্রাজিতের মত প্রসেনজিৎ পুণ্যবান ছিলেন না তাই এই মণি ধারণ করিয়া মৃগয়া করিতে গিয়া ইনি সিংহ কর্তৃক নিহত হন। পরে জাম্ববান সেই সিংহকে হত্যা করিয়া এই মণি সংগ্রহ করেন ও নিজপুত্রকে প্রদান করেন। সত্রাজিৎ প্রসেনজিৎকে দেখিতে না পাইয়া মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণই বোধহয় মণির লোভে প্রসেনজিৎকে হত্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ এই কথা জানিতে পারিয়া বনে গমন করিয়া নিহত প্রসেনজিৎ ও সিংহকে দেখিতে পান কিন্তু মণির সন্ধান পান না। ঋক্ষ পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে জাম্ববানকে পরাজিত করিয়া মণি উদ্ধার করেন ও সত্রাজিৎকে মণি ফিরাইয়া দেন। তখন বৃথা দোষারোপে লজ্জিত হইয়া সত্রাজিৎ মণি ও কন্যা সত্যভামাকে শ্রীকৃষ্ণের হাতে অর্পণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সত্যভামার পাণিগ্রহণ করেন এবং সত্রাজিৎকে মণি ফিরাইয়া দেন। অক্রুর, কৃতবর্মা ও শতধন্বী (যাদবরাজ) সত্যভামার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। বিফল মনোরথ হইয়া অক্রুর ও কৃতবর্মা (ভোজবংশীয় যোদ্ধা ছিলেন) সত্রাজিৎকে হত্যা করিয়া মণি গ্রহণের জন্যে শতধন্বাকে উত্তেজিত করেন। ইহার ফলে সত্রাজিৎ নিদ্রিত অবস্থায় শতধন্বা কর্তৃক নিহত হন। শতধন্বা মণিটি হস্তগত

করেন। স্যমন্তক মণির জন্যে শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে উৎপীড়িত করিলে তখন সে গোপনে এই মণি অক্রূরকে দিয়া পলায়ন করেন। অক্রূর কৃষ্ণের পিতৃব্য ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ শতধন্বাকে বধ করিতে মনস্থ করিলে শতধন্বা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অক্রূর ও কৃতবর্মার সাহায্য চাহিলে উহারা শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধে শতধন্বাকে সহায়তা করিতে রাজী হইলেন না। অন্যদিকে নববধূ সত্যভামা তখন পিতার মৃতদেহ তৈল মধ্যে রক্ষা করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হন। তখন কৃষ্ণ ও বলরাম শতধন্বাকে বধ করিলে পরে সত্যভামা তুষ্ট হন।

যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর অন্যান্য যাদব রমণীগণের সঙ্গে ইনি ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। পরে ইনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া কলাপ গ্রামে গিয়া জীবনের অবশিষ্টকাল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে অতিবাহিত করিয়া সমাধিলাভ করেন। সত্যভামার গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের 'ভানু' প্রভৃতি সপ্ত, মতান্তরে দশ পুত্র ও চারি কন্যার জন্ম হয়। গর্গ সংহিতা মতে সত্যভামার দশ পুত্রের নাম যথা ক্রমে — ভানু, সুভানু, স্বর্ভানু, প্রভানু, ভানুমান, চন্দ্রভানু, বৃহদ্‌ভানু, অতিভানু, শ্রীভানু ও প্রতিভানু, এই দশ তনয় প্রদ্যুম্নের সহিত দিগ্বিজয়ে গমন করিয়াছিলেন। আর মানু, ভৌমরিকা, তাম্রপর্ণী ও জরন্ধমা এই চার কন্যা।

গর্গ সংহিতার গোলোক খণ্ডে আছে, গোলোক বিহারী হরি যখন শ্রীকৃষ্ণরূপে ধরায় অবতীর্ণ হন তখন দেবী বসুধা সত্যভামারূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদ্ভুত রামায়ণে আছে, শ্রীকৃষ্ণ মহিষী সত্যভামা সঙ্গীতশাস্ত্র নিপুণা ছিলেন। দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। কল্কিপুরাণ মতে, শ্রীকৃষ্ণ কল্কি অবতার রূপে ধরায় অবতীর্ণ হইলে পরে সত্যভামাও পরম বৈষ্ণব শশিধ্বজ নৃপতির কন্যারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন এবং তখন তাঁহার নাম ছিল 'রমা'।

(*সহায়ক গ্রন্থ : গর্গ সংহিতা, স্কন্দপুরাণ, বিষ্ণুখণ্ড, পদ্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড, হরিবংশ ও কল্কিপুরাণ*)

পুরাণ কথা

সূর্য্যবংশীয় নৃপতি সত্যবিক্রম

আদিকল্পে 'সত্যবিক্রম' নামক সূর্য্যবংশীয় এক রাজা ছিলেন। দৈবদুর্বিপাকে শত্রুগণ কর্তৃক হৃতরাজ্য হইয়া সত্যবিক্রম নৃপতি ব্রহ্মর্ষি গুরু বশিষ্ঠদেবের আশ্রমে উপনীত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত বন্দনা করিয়া, কি উপায়ে তিনি পুনঃ নিজ রাজ্য লাভ করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। বশিষ্ঠদেব তাহাকে মহাকাল বনে যাইয়া তথায় অবস্থিত এক অদ্ভুত তাপসের নিকট সে বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। তখন সত্যবিক্রম বশিষ্ঠের পরামর্শ মত মহাকাল বনে গমন করতঃ সেই অদ্ভুত তাপসকে অবলোকন করিলেন। তখন সেই তাপসও রাজাকে দেখিয়া পরম সমাদর প্রদর্শন করিয়া অকস্মাৎ ভীষণ হুঙ্কার করিলেন। সেই অত্যদ্ভুত তাপসের 'হুঙ্কার' ('হুঙ্কার' ওঙ্কাররূপ নাদব্রহ্ম চিন্ময় ধ্বনি যা হল সৃষ্টির বীজ স্বরূপ) মাত্রই ভূমিতল ভেদ করিয়া পাঁচজন অতি পরমাসুন্দরী কন্যা উত্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে একজনের হস্তে এক কনকনির্মিত পীঠ; একজনের হস্তে জলপূর্ণ ভৃঙ্গার; দুইজন বীজন হস্তা। উহারা সসম্মান সত্যবিক্রম রাজার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং পঞ্চমা কন্যা নৃপতির পদদ্বয় প্রক্ষালনের নিমিত্ত উদ্‌গ্রীবা হইলেন। (ঐ পঞ্চকন্যা 'পঞ্চতত্ত্বের' রূপক প্রকাশ, যে 'পঞ্চতত্ত্ব' অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম অতঃপর সেই তাপস পুনরায় 'হুঙ্কার' করিলেন। অমনি দেবলোক হইতে অপ্সরাগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। তৎসঙ্গে এক পরম জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ ও (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের রূপ 'লিঙ্গজ্যোতি') সেই স্থলে আবির্ভূত হইল। তখন এইসকল পরমাশ্চর্য ঘটনা অবলোকন করিয়া রাজা তাপসকে ঐ সকল রহস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাপস বলিলেন যে ঐ সকল তাঁহার তপস্যার প্রভাবে সম্ভব হইয়াছে। তিনি আরও বলিলেন যে সেই জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আরাধনা করিয়া ঐরূপ অসামান্য ক্ষমতা তিনি লব্ধ হইয়াছেন। ঐ কথা বলিয়া সেই তাপস পুনরায় এক হুঙ্কার প্রদান করিলেন এবং তখনই তাঁহার মুখবিবর হইতে হুতাশন আবির্ভূত হইয়া চরাচর পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল। অতঃপর সেই মহাতাপস সেই মুখনিঃসৃত অগ্নিজ্বালা প্রশমিত করিয়া হুঙ্কার দ্বারা বায়ু-প্রবাহ সৃষ্টি করিলেন। তখন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। সত্যবিক্রম হতবুদ্ধি হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক ভীষণ শব্দ হইল এবং প্রাকারাদি পরিবৃত, সুবর্ণময় অট্টালিকাদি সমন্বিত জনসংকুল এক মহানগরী প্রাদুর্ভূত হইল! তৎপরে পুনরায় এক মহান্ শব্দ হইল এবং দুইজন নারী

দৃষ্টিগোচর হইল। তাহাদের একজন শুভ্রবস্ত্র, অপরজন কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিতা ছিলেন। ইহার পর; পুনঃ এক মহান শব্দ উত্থিত হইলে, দ্বিমস্তক, ষড়ানন এবং দ্বাদশপদ বিশিষ্ট এক পুরুষ আবির্ভূত হইলেন। পুনরায় শব্দ হইল এবং আর এক পুরুষ আবির্ভূত হইয়াই সপ্তভাগে বিভক্ত হইলেন। এইরূপে সেই তাপস রাজাকে নিজ তপস্যার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া রাজার কৌতুহল উপশম করিবার জন্যে নিম্নলিখিত ভাবে সমুদয় বিষয়ের অর্থ বুঝাইয়া দিলেন। —

শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিহিতা নারীদ্বয় হইলেন দিবা এবং রাত্রি। সেই অদ্ভুত আকৃতি-বিশিষ্ট পুরুষের মুখদ্বয় দুটি অয়ন (বামাবর্তন ও দক্ষিণাবর্তন)। ছয়টি মুখ ছয় ঋতু; দ্বাদশটি পদ দ্বাদশ মাস। অপর যে পুরুষ উৎপন্ন হইয়াই সপ্তভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তিনি সপ্ত সমুদ্র। এইভাবে রূপকাকারে তাপস ব্রাহ্মণ সংবৎসর প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে রাজা যদি সেই জ্যোতির্লিঙ্গের সাত্ত্বিক আরাধনা করেন তাহা হইলেই তিনি নিজ রাজ্য পুনর্বার প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবেন। রাজা সত্যবিক্রম তখন সেই তাপসের উপদেশ মত শিবলিঙ্গার্চনা করিয়া পুনরায় নিজ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

(*স্কন্দপুরাণের আবন্ত্য খণ্ড হইতে সংগৃহীত*)

সংকলন - শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(২৬)

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, পাড়া-প্রতিবেশীদের ঘর থেকে শাঁখ-ঘন্টার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে, মন্দিরে প্রতিমার আরতির

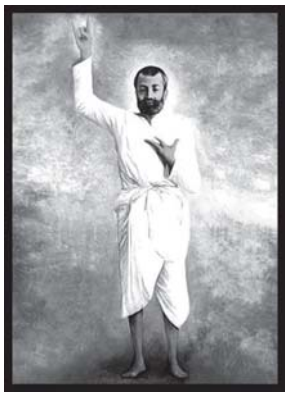

বাজনা বেজে উঠেছে, ভক্ত নরনারীতে মন্দিরের সম্মুখাংশ ভরে গেছে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের দেখা নেই; আকাশে মেঘ উঠেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকানি, এমন কি মন্দির মাঝেও ঝিলিক মারছে, কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের সে দিকে লক্ষ্য নেই, গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে অনন্ত মেঘের পানে তাকিয়ে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বলছেন - ''মা! মা! তুই মেঘের মাঝে থেকেও লুকোচুরি খেলিস? চিরদিনই কি এমনি করে লুকোচুরি খেলবি? মেঘগুলো তোর যে পেছন পেছন ছুটছে, তাদের দিকে কি একটুও চোখ ফেলবি নে? কেবল বিদ্যুতের হাসি দেখিয়ে লুকিয়ে বেড়াবি? মেঘগুলো-ও তো তোরই ছায়া, তবে তোর কায়ার সঙ্গে কবে মিশবে? মায়ার আবরণও তো তোরই দেওয়া। ওদের মায়ার ঘোমটা তুলে দে মা'' — এই বলতে বলতে, রামকৃষ্ণদেব তাঁর বাম হাতখানা বুকের উপর রেখে, দক্ষিণ হাতখানা ঊর্দ্ধগামী করে জড়সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন।

রাধার কথাও মনে পড়ে যায়, যখন তিনি যমুনায় জল আনতে গিয়ে, যমুনার কালোজলে শ্যাম দর্শন করে গেয়ে উঠেছেন — ''শ্যাম নিরখি, যমুনার জলে কেমনে বাড়াব পা? শ্যাম শিরে মোর ঠেকিবে চরণ, কেমনে ভেজাব গা?''

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমুদ্র দর্শনে এমনি ভাবেই কেঁদে উঠেছেন — ''হরিগুণ গায় আকাশে বাতাসে, সাগরে জলে হরি, কৃষ্ণগুণ গায় নীল সায়রে, আহা মরি! আহা মরি!''

মানব প্রকৃতির মাঝে-ই বিশ্বপ্রকৃতি লুকিয়ে আছে; অনন্ত আকাশের মাঝে যেমন অনন্ত চাঁদ লুকিয়ে থাকে এবং নিঝুম নিরালা রাতের মাঝেই তা বেশী প্রকাশ পায়, মানবাত্মার নীরব স্থিতিতে তেমনি পরমাত্মার মিলন ঘটে। এই নীরব পূজাকেই আমরা সাধনা বলি। নিরালা পূজায় মানব প্রকৃতি জেগে ওঠে। সূর্য্য উঠলে সুপ্ত মানুষ ও জীব জগৎ যেমন জেগে ওঠে এবং স্ব-স্ব কর্মে নিযুক্ত হয়, নির্জন ও নিরালা আরাধনায়, মানব প্রকৃতিও তেমনি জেগে ওঠে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একে একে মিলন দিতে থাকে, একেই সাধনা বলে। অন্তরের এক এক প্রকৃতি যখন বাহির প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যায়, তখন মানব অজ্ঞান হয়ে যায় বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ধ্যান ধারণায় মানবের দেহস্থিত এক এক অঙ্গে এক এক প্রকৃতি বহির্জগতের এক এক প্রকৃতির সঙ্গে যতই মিশে যেতে থাকে, ততই সে জড়ত্ব পেতে থাকে বা জড় সমাধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের আত্মা অনন্তের সাথে বিলীন হয়ে যেতো, তারই প্রতীক ছবি হিসাবে আমরা তাঁর দক্ষিণহস্তকে সেই

অনন্তের দিকে প্রসারিত দেখি। কিন্তু যিনি এই অনন্তের পানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আবার মাটির জগতে ফিরে আসেন, কেবল তাঁরই বামহস্ত বুকের মাঝে ন্যস্ত থাকে বা হাত মুঠো হয়েও তিনটে আঙ্গুল খোলা থাকে। একে পূর্ণ জাগরণ বলে। ''ওঁ'' মন্ত্রে যেমন তিনটে ব্রহ্মধ্বনি যথা অ, উ, ম লুকিয়ে আছে, মানবাত্মার মাঝেও তেমনি স্বত্ত্ব, রজঃ, তম; স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রূপ বিরাজিত থাকে। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনে এই তিন ব্রহ্মধ্বনি জেগে ওঠে; তারই প্রতীক ছবি আমরা রামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণ বা বাম হস্তে দেখতে পাই। এই ''অ'' ধ্বনিকে বলে অশরীরী; ''উ'' ধ্বনিকে বলে উতরোল এবং ''ম'' ধ্বনিকে বলে ''মন্দিরে''। ওঁ মন্ত্রের জাগরণ বা আত্মার জাগরণকেই বলে — ''অশরীরী উতরোল মন্দিরে''। আকাশের মেঘ কেটেছে, সূর্য্য উঠেছে।

এই ওঁ মন্ত্রের সাথে বা আত্মার সাথে যে আরও নয়টি প্রকৃতি সুপ্ত থাকে তাদেরই নাম মন্ত্রকে বলে ভূঃ, ভুবঃ, সঃ, তৎ-সবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো, দেবস্য ধীমহি ধীয়োণঃ এবং প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমা, বগলা মাতঙ্গী ও কমলা। এই দশ-মহাবিদ্যা, দশদিক বা দশটি গ্রহের নামও আমাদের আত্মার জাগরণে জাগ্রত হয়ে ওঠে। দশ দিকের বিশ্বপ্রকৃতির নিজ শরীরের দশ অঙ্গ সেই বিশ্ব প্রকৃতির আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। আলোর সাথে আলোর মিলন হলেই, যাকে আমরা স্থূলদেহ বলি, সে পড়ে থাকে। রামকৃষ্ণদেবও তাই এখানে সেই দশ দিকের আলো প্রকৃতির সাথে নিজ শরীরের দশটি অঙ্গ, যথা — হাত, মুখ, নাক, চোখ, কান, বুক, পেট, মাথা ও পা — পিঠের সঙ্গে মিলন দিয়ে, সেই এক শক্তিতে লীন হয়ে গেছেন। আলোর সাথে আলো মিশে গেছে। প্রকৃতি তখন এত প্রেমবিহ্বল হয়ে ওঠে যে, এই অবস্থায় তাঁর সবাইকে ''হরি'' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় রামকৃষ্ণদেবের অন্তরাত্মা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একীভূত হয়ে যেতো। সমস্ত বিশ্বের মাঝে, তিনি নিজের ছবি দেখতে পেতেন, তাই তাদের সকলকেই নিজেরই অঙ্গ বলে ভালবাসতে পারতেন। একেই বলা হয়, বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বপ্রকৃতি বা সেই রাধাশক্তি নামধারী আদি-জননী। তিনি নিজের মাঝে আদ্যামাকে দর্শন করতেন এবং তাঁরই প্রতিবিম্ব, প্রতি নরনারী এমন কি প্রতি জড় বা জীবের মাঝেও সন্দর্শন করতেন; এই হেতু সমস্ত সৃষ্টিকেই তিনি ''মা'' বলে সম্বোধন করতে পারতেন।

এমনি নেশার ঘোরে, তিনি প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই অতিবাহিত করতেন; কিন্তু ঐরূপ সমাধিভঙ্গের পর যে সব কথা কইতেন, তা শুনে মনে হত বিশ্বজননী নিজেই যেন কথা কইছেন। যেমন এই অবস্থার পর একদিন সামনে বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে বলছেন —''মা! তুই ছলনা করে এমন ভাবে ঘোমটা দিয়ে আছিস কেন? এই বুঝি তোর মায়ার ঢাকনি?'' — এই বলতে বলতে তিনি বিবেকানন্দের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন বিবেকানন্দের চোখেও সেদিন, এত অশ্রুপ্লাবন দেখা দিয়েছিল যে, তিনিও যেন মূর্চ্ছিত বা পূর্ণ ধ্যানস্থ হয়ে প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ মূঢ়বৎ বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাস্তব জগতের সাথে, মেলামেশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথাবার্তাও কিছু বদলে যেতো এবং পারিপার্শিক আত্মার সাথে নিজের আত্মার বিনিময় যোগ হোত, তাই তিনি একদিকে যেমন বলে উঠেছেন — ''পাঁকাল মাছের মত সংসারে বাস করতে হয়, যাতে গায়ে না পাঁক লাগে,'' অন্য সময় আবার বলছেন — ''কামিনী কাঞ্চনও যে, সেই আমার মা ভবতারিণী, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায়?'' মা-ই এসব মোড় ঘুরিয়ে দেন।

জীবজগতের সঙ্গে যুক্তভাবে একজনকে যেমন উপদেশ দিচ্ছেন — ''গুরুনিন্দা শুনে, চুপ করে চলে এলি?'' আবার অন্যজনকে বলছেন — ''গুরুনিন্দা করেছে বা শুনেছে তো তোর কী?''

গৃহভেদে যেমন সূর্য্যের আলো একইভাবে উজ্জ্বল হয় না, আধার ভেদে অবতার অঙ্গও সেইরূপ রূপ বদলায়; সুতরাং কণ্ঠধ্বনি বা মুখনিঃসৃত বাক্যের ভেদও লক্ষিত হয়। অনন্ত সাগরের জল যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রেরই যেমন আকার ধারণ করে, পরমব্রহ্মের রূপও তেমনি মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মানবাত্মারই মনের কথা কয়ে যান, তাই তাঁর আরেক নাম ''অন্তর্যামী''।

রামকৃষ্ণদেব এই শক্তিরই প্রকাশ স্বরূপ, একদিন তাই স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করছেন — ''তুই নিরালা ঘরে বসে, পুথিঁ পড়তে পড়তে হঠাৎ আমায় দেখে কাঁদছিলি কেন? কই এখানে তো আমায় দেখে অত কাঁদিস না? বলতো, তুই তবে কাকে দেখিস? আমাকে ? না মাকে?''

নরেন কেঁদে উঠে বলতে লাগলেন — ''আমি, তোমার মাকে এখনও দেখি নি, কেবল তোমায় দেখি, আর তোমাকেই চিনি।''

...ক্রমশঃ

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ২৯ : প্রকৃতি কি? পুরুষ ও প্রকৃতি তত্ত্ব কি?

উত্তর : সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণের সাম্য অবস্থাই হল প্রকৃতি। সেইজন্য প্রকৃতিকে ত্রিগুণময়ী বলা হয়। কালসংঘাতে 'হুঁ'কার শব্দ করতঃ প্রকৃতি দ্বিধা বিভক্ত হয়। এক হতে দ্বিঅংশের উৎপত্তি হয়েছে বলে পরস্পর মিলনের ইচ্ছা স্বভাবগত ধর্ম। পরস্পর স্বাভাবিকভাবে দ্বিঅংশের মিলন যখন সম্ভব হল না তখন প্রকৃতি পুরুষের বিপরীতভাবে মিলনে তৎপর হলেন। এই মিলন বা সংযোগ হতে আকাশের সৃষ্টি হয়। এই পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীতভাবে মিলনকে শাস্ত্রে 'বিপরীত রতাতুরা' বলা হয়। পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীতে মিলনই 'তারা' ভাব। এই ভাব হতেই 'তারা' মূর্তির আবির্ভাব সূচনা করে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে —

''সত্যলোকে নিরাকারা মহাজ্যোতিঃ স্বরূপিণী
মায়াচ্ছাদিতাত্মনী চণকাকার রূপিণী।।
মায়া-বল্কলং সংত্যজ্য দ্বিধা ভিন্না যদোন্মুখী।
শিবশক্তি বিভাগেন জায়তে সৃষ্টি কল্পনা।।''

—অর্থাৎ, ''সত্য লোকে আকার রহিত মহাজ্যোতিঃ স্বরূপ পরমব্রহ্ম মহাজ্যোতিঃস্বরূপা নিজ মায়া দ্বারা নিজে আবৃত হয়ে চণক তুলা ভাবে (ছোলার দানার মত) বিরাজিত আছেন। চণক যেমন একটি খোসার মধ্যে অঙ্কুরসহ দুটি ডালের দানার মত একত্রে আবদ্ধ থাকে, পুরুষ ও প্রকৃতি সেইরূপ ব্রহ্মচৈতন্যসহ মায়ারূপ বল্কল ভেদ করে শিবশক্তিরূপে প্রকট হয়েছেন।'' প্রকৃতি পুরুষাত্মক জীবদেহ ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা সচেতন হয় বলে এখানে 'ব্রহ্মচৈতন্যসহ' কথাটি বলা হয়েছে। ব্রহ্মচৈতন্য পরিত্যক্ত হলে জীবদেহ জড়ে পরিণত হয়। নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় হলেই ব্রহ্ম, আর সগুণ বা প্রকাশ হলেই ঈশ্বর বা পুরুষ বলা হয়। প্রকট বা সগুণ হবার ইচ্ছাশক্তিই প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তি মহামায়া। ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তিই কালিকা দেবী; তাই 'মা' আদ্যাশক্তি মহামায়া নামে অভিহিতা। 'যোগমায়া ব্রহ্মের অন্তরঙ্গা শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি হলেন 'মহামায়া'। একই আদ্যাশক্তি পঞ্চতন্মাত্রা ও পঞ্চভূতে বিরাজ করেন অতিসূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতমভাবে আত্মগোপন করে। স্থূল ও সূক্ষ্মে শক্তির বিকাশ হয় পাঁচ ভাবে — পরা, অপরা, যোগমায়া, মহামায়া ও কুণ্ডলিনী; পরাশক্তি নির্গুণা এবং অপরা শক্তি ভোগাত্মিকা। কুলকুণ্ডলিনী চিচ্ছক্তি এবং কুণ্ডলিনী জীবনী শক্তি বা প্রকৃতি।

সগুণ ও নির্গুণের মিলনাত্মক ভাবই ব্রহ্ম। সগুণ মহাশক্তি বা মা এবং নির্গুণ শিব বা বাবা। শিব লীলাময়, গৌরী বা শক্তি লীলাময়ী — এই-ই হল পুরুষ ও প্রকৃতি সমষ্টি ও ব্যষ্টিগত তত্ত্ব রহস্য।

প্রশ্ন ৩০ : প্রয়াগতীর্থে ত্রিবেণী স্নানের রহস্য কি?

উত্তর : শাস্ত্রে আছে, ''অন্তঃ স্নানবিহীনস্য বহিঃস্নানেন কিং ফলম্?'' — অর্থাৎ, অন্তঃস্নান ব্যতীত বাহ্যিক স্নানে কোন ফল নেই। যিনি আত্মতীর্থ জ্ঞাত হয়ে আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে এই তীর্থরাজ ত্রিবেণীতে মানস স্নান করেন, তিনি মুক্তিপদ লাভ করেন। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রয়াগে স্নান-সম্বন্ধে বলছেন, ''আত্মা নদী সংযম পুণ্যতীর্থা সত্যেদকা শীলতটা দয়োর্ম্মিঃ, তত্রাভিষেকং কুরু পাণ্ডুপুত্র! ন বারিণা শুদ্ধতি চান্তরাত্মা।।'' — অর্থাৎ, ''হে পাণ্ডুপুত্র অর্জুন! ইন্দ্রিয় সংযম যাঁর পবিত্র ঘট, সত্য ব্যবহার পবিত্র জল, সরল স্বভাব পাহাড় এবং দয়া যে নদীর তরঙ্গ, তুমি সেই জ্ঞান নদীতে স্নান কর, বাহ্য জলে মন পবিত্র হতে পারে না।'' স্নাত হয় ভক্তবৃন্দ পবিত্র বাহ্যিক নীরে পৌরাণিক তত্ত্বের পুণ্য নির্য্যাসে। ধৌত হয় ভক্তের তমোরূপী মনের যত কালিমা যমুনায়, রজো ধৌত হয় গঙ্গায় এবং সত্ত্ব বর্দ্ধিত হয় সরস্বতীর পবিত্র স্পর্শে। শ্রবণেন্দ্রিয়ে শ্রুতিগোচর হয় শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি যা রাধা-রাধা নামের জোয়ার আনে কালো জলে যমুনা পুলিনে। মনে উদয় হয় পরম বৈরাগ্যভাব আর গৈরিক বসন ধারিনী পতিত পাবনীর শুভ্র স্বচ্ছ স্রোতে মন ভেসে যায় অনন্তের পানে। পরম গুরুভক্ত সম্রাট অশোক! তোমার অমরকীর্তি চিহ্নস্বরূপ ধ্বংসাবশেষ দুর্গ, শত ঝঞ্ঝা শত বিপদ অতিক্রম করতঃ সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে মাথা উঁচু করে! আর আহ্বান জানিয়ে যেন বলছে কেল্লা— 'ধর্মের জয় অধর্মের ক্ষয় এই যমুনার তীরে।'

সাধকগণের পরমাগতি লাভ হয় এই সঙ্গমে। মনের সংযমই সঙ্গম বা একত্বলাভ, আদিতত্ত্বে গমন, প্রকৃতির বিলয়। আছড়ে পড়ছে গঙ্গা দেবীর লাল জল যমুনার প্রশান্ত বক্ষে। মনে হয় যেন বিরহ কাতরা শ্রীরাধিকা ঝাঁপিয়ে পড়ছেন কৃষ্ণের বক্ষে মিলনানন্দে। তাঁর মনে নেই এতটুকু সন্দেহের কণা; পুরাণ শাস্ত্রে বলেছেন, ''এখানে স্নান করলে জীব মুক্তি পায়।'' সেই বিশ্বাস ও আস্তিক্য বোধে যখন অন্তরে সত্য প্রতিষ্ঠা হয় তখন নিশ্চয়ই জীব মুক্তি পায় বাহ্যিক স্নানে। কত ভক্ত, কত সাধক, কত মুনি-ঋষি স্নান করেন এই তীর্থরাজ প্রয়াগে।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

হেমকুণ্ডের পথে
(৩)

২০১২-র প্রকৃতির রুদ্ররূপের চিহ্ন গায়ে নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে উত্তরাখণ্ডের একটা বড় অংশ। শ্রীশ্রীমায়ের স্নেহ বিধুর কঠিন শাসনে পায়ে বেড়ী পড়েছে আমার, 'এখন কোনো মতেই উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল হিমালয়ে যাওয়া চলবে না' — মায়ের কঠিন নির্দেশ, কিন্তু হিমালয়ের আমোঘ আকর্ষণ উপেক্ষা করব কিভাবে? গাড়োয়াল হিমালয় আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে বারবার। আবেদন নিবেদন শুরু করি শ্রীশ্রীমায়ের চরণে। অনুমতি চাই ফুলের জলসায় আবারও একবার পা রাখার জন্য। কখনও শ্রীশ্রীমায়ের কাছে সরাসরি আবেদন, কখনও ক্রিয়ার শেষে তাঁর চরণে নিঃশব্দ নিবেদন, আবার কখনও শুধুই দুচোখ ভরা আকুতি নিয়ে তাঁর সামনে বসে থাকা। অবশেষে বরফ গলল। কাজের জন্য ওই অঞ্চলে যাওয়ার অনুমতি দিলেন শ্রীশ্রীমা। তখন আমাকে আর পায় কে? জোর কদমে শুরু হল প্রস্তুতি। যাত্রার দিন স্থির হল ২১শে জুলাই ২০১৫। দেখতে দেখতে যাওয়ার দিন এগিয়ে আসে। ১৭ই জুলাই হঠাৎই আশ্রম থেকে শিবদার (স্বামী শিবানন্দজী) ফোন 'নেপালে' ভূমিকম্পের ছোঁয়া এসে পড়েছে উত্তরাখণ্ডেও, রুদ্রপ্রয়াগের কাছে রাস্তা বন্ধ, কাজেই এখন যাওয়া যাবে না। ছুটে আসি শ্রীশ্রীমায়ের কাছে। আমাকে দেখেই স্নেহের সুরে মা বললেন 'এখন তোর যাওয়া হবে না। একমাস পরে যাস।' সেই মত পিছিয়ে গেল যাওয়ার দিন। শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদ নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম ১৬ই আগস্ট, গন্তব্য — ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স। লক্ষ্য ২০১২-র প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে এই অঞ্চলের সরেজমিন পর্যবেক্ষণ।

ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স

নির্দিষ্ট সময়ের আধঘন্টা আগেই আমাকে হরিদ্বার পৌঁছে দিল ' কুম্ভ-এক্সপ্রেস। ভারত সেবাশ্রম সংঘে একরাতের বিরতি। পরদিন ভোরে যাত্রা শুরু গোবিন্দঘাটের পথে। এবারে হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স এর পথে পর্য্যটকের সংখ্যা দেখলাম হাতে গোণা। বিকেলের শেষে নির্বিঘ্নে পৌঁছে যাই গোবিন্দঘাট। চলার পথে চোখে পড়ল প্রকৃতির ধ্বংসলীলার চিহ্ন গায়ে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর, শ্রীকোট। চাক্ষুস করলাম প্রকৃতির রুদ্ররূপের মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। যন্ত্র সভ্যতার আত্মগর্বে গর্বিত মানুষ প্রাকৃতিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল চারধামের রক্ষাকর্ত্রী ধারাদেবীর পাহাড়টিকে। উদ্দেশ্য অলকানন্দার বুকে ড্যাম বানানো। গাড়োয়াল হিমালয়ের পরিবর্তনশীল পাহাড় সহ্য করেনি ডিনামাইটের বিস্ফোরণ। কেঁপে উঠেছিল গোটা এলাকা। শুরু হয়েছিল কম্পন। ধারাদেবীর মন্দির নিমজ্জিত হয়েছিল অলকানন্দার গর্ভে। শুরু হয়েছিল মেঘভাঙা বৃষ্টি। সব মিলিয়ে ধূলিঃসাৎ মানুষের আমিত্ববোধ। অসহায় চোখে সৃষ্টির দেবতার ধ্বংসলীলার সাক্ষী হতে হয়েছে গাড়োয়াল বাসীদের। এপথে আসার আগে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখ থেকেই শুনেছিলাম সৃষ্টি আর ধ্বংসের দেবতার এই স্ববিরোধীরূপের কথা। এখানে এসে তাকেই প্রত্যক্ষ করলাম আরও ভালো করে।

গোবিন্দঘাটের নবনির্মিত লোহার ঝোলাপুল পেরিয়ে হাঁটা শুরু করি চড়াই পথে। গন্তব্য ঘাংঘারিয়া। সেদিনের ১৩ কিলোমিটার পথ আজ বেড়ে হয়েছে ১৬ কিলোমিটার। ছবির মতো গ্রাম পুলনা আজ জনশূন্য — শুধুই ধ্বংসাবশেষ। পায়েপায়ে পেরিয়ে আসি জঙ্গলের রাস্তা। পৌঁছোই ঘাংঘারিয়ায়।

এবার আমার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স। আসার পথে আর হেমকুণ্ডের রাস্তায় ব্রহ্মকমল, ব্লুপপিসহ রংবেরঙের ফুলের যে সমারোহ চোখে পড়ল তাতেই মন ভরে গেল। ভ্যালিতে আদৌ আর যাওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা ভাবছি। হঠাৎই যেন শুনতে পেলাম শ্রীশ্রীমায়ের অমোঘ নির্দেশ। 'যে পথে এসেছ, যে কাজে এসেছ তা থেকে বিচ্যুত হয়ো না।' ভোররাতে ঘরের দরজায় করাঘাত। দরজা খুলে দেখি বলিরেখাময় এক অনাবিল হাসিমুখ। একগাল হেসে বয়স্ক গাড়োয়ালি মানুষটি আমায় বললেন —'চলুন যাওয়া শুরু করি। চলার পথে পড়বে ভূর্জগাছের জঙ্গল, আপনার তো ভূর্জপত্রের প্রয়োজন, চলুন নিজেই পেড়ে নেবেন।' অবাক হয়ে যাই। বুঝতে পারি এতো শ্রীশ্রীমায়েরই নির্দেশ। বেরিয়ে পড়ি। আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে বৃদ্ধ মানুষটি, পথের সঙ্গী নানা রঙের হিমালয়ের পাখি তারাও চলে সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে। দেখতে দেখতে পুষ্পবতী নদীর ব্রীজ পেরিয়ে প্রবেশ করি ভূর্জ গাছের জঙ্গলে। দেহে মনে নতুন এক উদ্যম।

গাছে উঠে পেড়ে আনি ভূর্জ গাছের ছাল — ভূর্জপত্র। ফিরে আসার পর আশ্রমে যেতেই শ্রীশ্রীমা বললেন খুব কাজের জিনিস এনেছিস। শুনে একটাই কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল — 'তুমিই তো আনালে'।

ঘাংঘারিয়া থেকে ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স এর রাস্তা সাড়ে তিন কিলোমিটার থেকে বেড়ে হয়েছে পাঁচ কিলোমিটার। চড়াইও বেড়েছে আগের থেকে বেশী। ভ্যালির পরিধির বিস্তার ঘটেছে অনেকটাই। আগের ছয় কিলোমিটার ভ্যালি বেড়ে হয়েছে দশ কিলোমিটার। ফুলেরও বৈচিত্র্য বেড়েছে। বেশ কিছু নতুন প্রজাতির ফুলও চোখে পড়ল। ভ্যালিতে বেড়েছে ভালুকের সংখ্যাও। তুষার চিতাবাঘের আনাগোনার প্রমাণও পেলাম পুষ্পবতী নদীর আশেপাশে। নদীর ধারে ফুলের জলসায় নিত্য নতুন অতিথির আবির্ভাব। সেই সব অতিথির সান্নিধ্য পেতে গেলে আবারও আসতে হবে এখানে জুলাই মাসের শেষপর্বে। পশ্চিম আকাশে ঘন কালো মেঘ। দেখতে দেখতে শুরু হল বৃষ্টি। তাড়াতাড়ি আশ্রয় নিই পাথরের আড়ালে। ঘন্টা খানেকের বাদল বেলার শেষে ফের হেসে ওঠে সূর্য্য। আমরাও ফেরার পথ ধরি। *সমাপ্ত*

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীসৌরভ বসু

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

ত্রয়বিংশপর্য্যায় — (বিবস্বৎ)

বেদ ও পুরাণ কথায় যম, মনু, সাবর্ণিমনু, যমুনা, অশ্বিদ্বয় এরা সকলেই বিবস্বানের সন্তান। মনু যেহেতু বিবস্বানের পুত্র তাই অনেক সময় তাঁকে পুরাণে বৈবস্বত মনু বলা হয়েছে। দেবতারা যেমন বিবস্বানের সন্তান তেমনি আদি মানবও বিবস্বানের সন্তান। ঋক্ মন্ত্রে পাই বিবস্বতের কাছে অগ্নি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

'ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন্ আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে।
অরেজেতাং রোদসী হোতৃবূর্যেহসগ্নোর্ভারমযজো মহো বসো।।'
(ঋগ্বেদ ১/৩১/৩)

এই অগ্নিকেই আবার ঋগ্বেদের অনেক স্থানে বিবস্বতের দূত বলা হয়েছে। অগ্নি একবার তাঁর মাতা-পিতা রূপ অরণিদ্বয় থেকে উৎপন্ন হয়েছিলেন বিবস্বৎ রূপে। ঋগ্বেদের ৫/১১/৩ মন্ত্রে এরূপ কথা আছে। অগ্নিই যে বিবস্বান বা সূর্য একথা এখান থেকে বোঝা যায়। অরণি ও মন্থনদণ্ড ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করা হোত বৈদিক যুগে। তাই অগ্নি তাদের পুত্রস্বরূপ। আবার পার্থিব অগ্নিই যে সূর্যরূপে অবস্থিত এটা নিরুক্তকার দেখিয়েছেন দেবতাদের স্থানভাগিত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে। এইসব দেবতার ভক্তি সাহচর্য্যের তত্ত্ব আমরা অগ্নিতত্ত্বের আলোচনার সময় বিস্তৃততরভাবে উপস্থাপিত করব। বিবস্বানই দ্যুস্থানে ইন্দ্ররূপে অবস্থান করেন বলে মধ্যমাগ্নি বা বৈদ্যুতাগ্নি উৎপন্ন হয় এবং মাধ্যমিকা বাকের উৎপত্তি হয়। তাই ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে ইন্দ্রের সঙ্গে বিবস্বতের স্তুতি দেখা যায়। ইন্দ্রকে আবার কখনো কখনো বিবস্বতের প্রার্থনায় আনন্দিত হতেও দেখা যায় (ঋগ্বেদ ৮/৬/৩৯)। ইন্দ্র বিবস্বতের কাছে নিজের ধনসম্পত্তি গচ্ছিত রাখতেন এমন উল্লেখও ঋগ্বেদে আছে (ঋগ্বেদ ২/১৩/৬)। সোমের সঙ্গে সূর্যরূপী বিবস্বতের নিবিড় সম্পর্কের কথাও ঋগ্বেদে কথিত হয়েছে। সোম-মণ্ডলের বিভিন্ন মন্ত্রেই সোম ও বিবস্বতের সম্পর্ক সোমরস ক্ষরণের রূপক। নবম মণ্ডলের ৯/১০/৫ মন্ত্রে বিবস্বতের সঙ্গে ঊষার সম্পর্কের কথা পাওয়া যায় তার কারণ আকাশে ঊষার আগমনের পরেই সোমযাগের জন্য সোমলতার রস বের করার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়।

বিবস্বানের থেকেই অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি; কারণ অশ্বিদ্বয় নিরুক্তের মতে দিবা ও রাত্রির অভিমানী দেবতা। বিবস্বৎ পদটি ঋগ্বেদের বহু মন্ত্রে (১/৪৪/১, ১/৯৬/২, ৭/৯/৩, ৩/৩৪/১৩) অগ্নি ও ঊষার বিশেষণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ তারাও দীপ্তিমান। ভাষাতত্ত্বের পণ্ডিতেরা ঊষা ও বিবস্বৎ এই দুটি শব্দই বশ্ ধাতু থেকে উৎপন্ন বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে ঋগ্বেদে বিবস্বৎ যম-যমীর পিতা। আবেস্তাতেও বিবন্হুন্ত হলেন যমীর পিতা। সেখানেও তাঁকে বলা হয়েছে সোমরসের প্রস্তুতকর্তা। এসব আখ্যান থেকে ম্যাকডোনেল সাহেব বিবস্বৎকে ইন্দোইরাণীয় যুগের দেবতা বলে মনে করেছেন। প্রাকৃতিক তত্ত্বের বিচার করে অধিকাংশ পণ্ডিতই বিবস্বৎকে উদীয়মান সূর্য বলে মনে করেছেন। বেদে অশ্ব সূর্যের বা সূর্য রশ্মির প্রতীক। সরণ্যুর

উপাখ্যানও এনাকে সূর্য দেবতা বলে মনে করায়।

যাঁরা দিনরাত্রির দেবতা জন্মদাতা হিসাবে বিবস্বানকে দেখাতে চান তাঁরা বলেন দিন ও রাত্রিকে প্রথমে ঋষিরা যম-যমী বলতেন। সুর্যের উদয়াস্তের মধ্যেই দিনরাত্রির অবস্থান, ম্যাক্সমূলার এই তত্ত্বকেই সমর্থন করেছেন। হিলেব্রাণ্ড তাই স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করেছেন - সূর্য আর বিবস্বৎ প্রকৃত প্রস্তাবে একই দেবতা। নিরুক্তশাস্ত্রের রচয়িতা যাস্ক স্থানগত দৃষ্টিতে দেবতাদের ত্রিবিধত্বের কথা বলেছিলেন সেই ধারায় দেখলে ইনি দ্যুস্থানীয় দেবতা হিসাবে সূর্যেরই প্রতিরূপ।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

রাজস্থানের যোধপুর জেলাস্থিত একটি ছোট্ট গ্রাম রাবনিয়া। ইহার দক্ষিণ দিকে একটি বিশাল দীঘি বা পুষ্করিণী আছে যাহাতে এত জল মজুত থাকে যে গ্রামের সকলের জলের চাহিদা তাহার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। গ্রামের উত্তর দিকে একটি ছোট এবং বিখ্যাত পাহাড় গ্রামটির সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছে।

এই গ্রামেরই এক সুপ্রসিদ্ধ অসাধারণ কন্যা রূপকঁৰরজীর নামানুসারে গ্রামটির নাম হয় রূপনগর। শ্রীশ্রীরূপকঁৰরজী রূপনগরের একজন বহু সম্মানে ভূষিতা নারী ছিলেন।

এই রূপনগর গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের নিবাস ছিল। তখনকার দিনে পরিবারের সংখ্যা প্রায় চারশোর মত ছিল। যোধপুরের মহারাজা এই গ্রামটিকে চার-ভাগে বিভক্ত করিয়া একজন শেখাৱত সর্দ্দার এবং তিনজন কুঁপাৱত সর্দ্দারের হস্তে জাগীরদার প্রথানুসারে ন্যস্ত করেন। এই শেখাৱত পরিবারের শ্রীমদন সিংহজী তাঁহার কর্মস্থলে একবার অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া মহারাজার কেল্লা রক্ষার নিমিত্ত জীবনদান করিয়াছিলেন। তাহারই স্বীকৃতি স্বরূপ এবং তাঁহার সম্মান রক্ষার্থে যোধপুরের মহারাজা ইহাদের রাবনিয়া গ্রামের জায়গীর প্রদান করেন। তখন মদন সিংহজীর পরিবার তাহাদের খাটোয়া গ্রাম হইতে এই রাবনিয়া গ্রামে চলিয়া আসেন এবং এই স্থানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপূর্বে রাবনিয়া গ্রামটি খালসা গ্রাম রূপে পরিচিত ছিল।

এই অসীম সাহসী মদন সিংহজীর তৃতীয় ধারার উত্তর পুরুষ ছিলেন দুই ভ্রাতা বড় ভাই শ্রীচন্দ্র সিংহজী এবং ছোট ভাই শ্রীলাল সিংহজী। এই লাল সিংহজীর দুই কন্যা এবং তিন পুত্র ছিল। বড় ভাই চন্দ্র সিংহজীর এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। শ্রীচন্দ্র সিংহজী ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর গৃহী সাধক। পূজার্চ্চনা এবং সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও স্বাধ্যায় ইত্যাদিতে তাঁহার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইত।

শ্রীশ্রীরূপকঁৰর বাইসা ছিলেন শ্রীলাল সিংহজীর দ্বিতীয় সন্তান। তাঁহার প্রথম সন্তানও কন্যা ছিল, নাম সায়রকঁৰর বাইসা। এই রূপকঁৰরের জন্মলগ্ন ছিল অতীব শুভ মুহূর্তে। ১৯০৩ খৃঃ ১৬ই আগস্ট জন্মাষ্টমীর দিন রাত্রি ১২টার সময় যখন গৃহে মহাধূমধামের সহিত জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে পূজা ও ভজনকীর্ত্তন চলিতেছিল, সেই শুভ মুহূর্তে রূপকঁৰর গৃহ আলো করিয়া মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইলেন। এই অত্যন্ত শুভলগ্নে তাহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া দ্বিতীয় কন্যাসন্তান হওয়া সত্ত্বেও পরিবারস্থ কাহারো মনে বিষাদের রেখাপাতও হইল না। বরং পরমানন্দে তাহার জন্মকুণ্ডলী জ্যোতিষের দ্বারা তৈয়ার করানো হইল। তাহার জন্মকুণ্ডলী অনুসারে সবদিক বিচার করিয়া পণ্ডিত মহাশয় রায় দিলেন যে, এই জাতক এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক গুণের অধিকারী হইবেন এবং ধর্মগুরুরূপে তিনি প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।

শিশুকাল হইতেই তাহার অসাধারণ সৌন্দর্য্যের মধ্যে এক আধ্যাত্মিক দিপ্তী প্রকাশিত হইত। এইজন্য তাহার পিতা-মাতা পরম স্নেহে তাহার নাম রাখিলেন রূপকঁৰর। 'রূপা' নামেই তাহাকে সম্বোধন করা হইত। বাল্যকাল হইতেই তাহার মধ্যে কোন চপলতা ছিল না। সাধারণ বালক-বালিকাদের ন্যায় খেলা-ধূলায়ও তাহার আগ্রহ ছিল না। তিনি দেবতাদের ছবি ও

মূর্তি লইয়া পূজা-পূজা খেলিতেন। সমবয়সী সঙ্গীদের অপেক্ষা তিনি বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের সঙ্গ অধিক পছন্দ করিতেন। তিনি যেমন স্বাস্থ্যবতী তেমনি প্রসন্নচিত্ত বালিকা ছিলেন।

এই বালিকার উপর তাহার জ্যেঠামশায় অর্থাৎ শ্রীচন্দ্র সিংহজীর প্রভাব ছিল অসাধারণ। রূপা তাঁহার জ্যেঠামশায়ের নিকটই অধিকক্ষণ সময় কাটাইতেন।

ইহাদের গৃহের প্রবেশ দ্বারের নিকটেই একটি অতি বৃহৎ জালবৃক্ষ ছিল। তাহার শীতল ছায়ায় একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শ্রীচন্দ্র সিংহজী তাঁহার বেশীর ভাগ সময় এই বৃক্ষের তলায় শিবলিঙ্গের পূজা-অর্চনায় অতিবাহিত করিতেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে চারটার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া নিকটস্থ পুকুরে প্রাতঃস্নান করিয়া এক ঘটি জল লইয়া আসিতেন। তাহা দ্বারা শিবের অভিষেক করিয়া ধূপ, দীপ দ্বারা পূজা করিতেন। পূজা অন্তে ঐ শিবলিঙ্গের নিকটস্থ একটি শিলাখণ্ডে বসিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মহামন্ত্র জপ করিতে করিতে সম্পূর্ণভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন। কোন কোন সময় জপে এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে কখন যে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িত তাহাও বুঝিতে পারিতেন না। এইভাবে তাঁহার সাধনা শেষ হইলে তিনি দিনে একবার মাত্র ভোজন করিতেন। তাঁহার আহারও ছিল অতি সামান্য। দ্বিপ্রহরের আহার সমাপন হইলে তিনি ঐ শিলাখণ্ডে বসিয়াই স্বাধ্যায় করিতেন। তিনি তখন পুরাণ, রামচরিতমানস, শ্রীভাগবত পাঠ করিতেন। এই পাঠের সময় কিছু কিছু ভক্তলোক আসিয়া তাহা শ্রবণ করিতেন। সন্ধ্যার সময় ধূপদীপ দ্বারা আরতি করিয়া পুনরায় জপে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। রাত্রে শয্যা গ্রহণের পূর্ব পর্য্যন্ত তাঁহার এই নিয়মই চলিত।

রূপাবাইসা তাহার বড় পিতৃব্যের এইরূপ জীবনধারায় অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহার বড় পিতৃব্যের নিকট ঘন্টার পর ঘন্টা বসিয়া থাকিতেন এবং দ্বিপ্রহরের খাবার তাঁহার জন্য লইয়া আসিতেন। রূপা জ্যেঠামশায়ের আহার গ্রহণের পরেই নিজে ভোজন করিতেন। চন্দ্র সিংহজী সংসারী হইয়াও একজন সন্তের ন্যায় জীবনযাপন করিতেন। তাঁহার এই ভ্রাতুষ্পুত্রী রূপাও তাঁহার নিকট সারাক্ষণ থাকিয়া তাঁহার পূজাদি দেখিতেন। পূজাদি সমাপ্ত হইলে তাঁহার জন্য খাবার লইয়া আসিতেন। জ্যেঠামশায়ের খাওয়া সমাপ্ত হইলে নিজেও সেখানে বসিয়াই আহার গ্রহণ করিতেন। কোন কোন দিন তাহাদের আহার গ্রহণ করিতে অপরাহ্ন হইয়া যাইত। রূপা ক্রমে দিনে একবার মাত্র আহার করিতে লাগিলেন। রূপা তাহার পিতৃব্যকে একজন সন্তের ন্যায় সেবা ও শ্রদ্ধা করিতেন। রূপা সমস্ত সাধু-সন্তদেরই, যাঁহারা তাহাদের গৃহে আসিতেন তাঁহাদের প্রাণ দিয়া সেবা-যত্ন করিতেন। তিনি পশুপক্ষীদেরও খওয়াইতে খুব ভালবাসিতেন। ক্রমশঃ দিনে তিনি একবার মাত্র আহার করিতে লাগিলেন। তখন যদি কোন অভুক্ত ব্যক্তি আসিয়া পড়িত, রূপা তাহার নিজের খাবার তাহাদের খাওয়াইয়া দিতেন। তিনি আশে-পাশে যদি কোন গরু বা কুকুরকে অভুক্ত দেখিতেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে নিজের খাবার তাহাদের মধ্যে দিয়া দিতেন। পক্ষীদের জন্য দানা ছড়াইয়া দেওয়া তাহার একটি নিত্য কর্ম ছিল।

এইভাবে পুরা পরিবারের স্নেহ ও আদরে রূপা বাইসার বাল্যজীবন বেশ আনন্দেই চলিতেছিল। কিন্তু হঠাৎই মহাকালের করাল ছায়া তাহাদের পরিবারের উপর পতিত হইল। প্রথমে রূপার মাতার ১৯১৫ খৃঃ হঠাৎ জীবনাবসান হইল। রূপার বড় ঠাকুমা অর্থাৎ চন্দ্রনাথ সিংহজীর মাতা তখন তাহাদের দেখাশুনার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। রূপার বয়স তখন ১২ বৎসর। রূপা এবং তাহার দিদি সায়র বাইসার উপরই তাহাদের ছোট তিন ভাইয়ের লালন-পালনের দায়িত্ব পড়িল। সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ ভ্রাতার বয়স তখন তিন বৎসর ছিল। মাতার অবর্তমানে দুই ভগিনী ছোট ভাইদের লালন-পালন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মধ্যে সম্পর্ক আরও গভীরতর হইল।

মাতার মৃত্যুশোক পুরোপুরি সামলাইবার পূর্বেই সর্বব্যাপী প্লেগ রোগ আসিয়া তাহাদের পরিবারেও থাবা বসাইল। ১৯১৭ খৃঃ প্লেগের প্রথম শিকার হইল সায়র বাইসা। তাহার পরেই পিতা লাল সিংহজীকে গ্রাস করিল। এইভাবে পরপর তিনটি জীবনের অবসান হইল। এই সময়ে রূপার বয়স ১৫ বৎসরে পদার্পণ করিল।

দিদি সায়রের মৃত্যুর পর রূপাই এখন পরিবারের মধ্যে সবার বড়, তাই এখন তিনি দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিলেন। সকলের ছোট ভাইটির প্রতি তাহার অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন ছিল। রূপার প্রতিও পরিবারের সকলের অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও রূপা কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা রাখিয়া তাহার জ্যেঠামশায়ের সেবায় আরও অধিক দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। চন্দ্র সিংহজীও নিজ কন্যার ন্যায় রূপাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন।

সে সময় আজমীর-জয়পুর সড়কের নিকটবর্তী 'বালা' নামক একটি গ্রাম ছিল। এই বালা গ্রামে পূর্বে কুঁপাৱত সর্দারদের নিবাস ছিল। কিন্তু তাহারা অন্যত্র যাইয়া বসতি স্থাপন করিলে যোধপুরের মহারাজা এই গ্রামটির সুরক্ষার জন্য রাজপুতদের আনিয়া এখানে বসানো স্থির করিলেন। তখন সকলের মিলিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'খরবা' গ্রামের গিরিধারী সিংহ যোধাকে এই স্থানে জমিদারী প্রদান করিয়া বসবাস করিতে বলিলেন। তখন তাহারা সপরিবারে বালা গ্রামে চলিয়া আসেন। তাহারই বংশধর ছিল চিমন সিংহজী এই চিমন সিংহজীর তিন পুত্র যথাক্রমে জালম সিংহ, ইন্দ্র সিংহ এবং জুঁঝার সিংহ। এই জুঁঝার সিংহজীর সহিতই রূপা বাইসার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথমে রূপকঁৱরের বড় ভগিনী সায়র কঁৱরের সগাই এই জুঁঝার সিংহজীর সহিত হইয়াছিল। তখন তিনি যোধপুর অশ্বসেনা বাহিনীতে চাকরী করিতেন। তাহার বিবাহ পর্ব সম্পন্ন হইবার পূর্বেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইয়া গেল। এবং এলায়েড্ রাষ্ট্রের সৈন্যদের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকেও জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ফ্রান্সে যাত্রা করিতে হইল। তিনি যখন ফ্রান্সে কর্মরত ছিলেন, সেই সময় প্লেগে আক্রান্ত হইয়া সায়র বাইসার মৃত্যু হয়। সায়র বাইসার মৃত্যুর পর তাহার পিতা লাল সিংহজীর ইচ্ছা ছিল জুঁঝার সিংহজীর সহিত রূপা বাইসার বিবাহ দিবার। কিন্তু লাল সিংহজীও প্লেগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার মৃত ভ্রাতার ইচ্ছানুসারে জুঁঝার সিংহজী যখন ছুটি লইয়া দেশে ফিরিলেন, চন্দ্র সিংহজী তখন তাহার পুত্র রেৱত সিংহজীকে বালা গ্রামে পাঠাইয়া এই সগাই-এর প্রস্তাব দিলেন। কিন্তু জুঁঝার সিংহজী বলিলেন, ইহার পর যখন তিনি অবকাশমত আসিবেন, সেই সময় অর্থাৎ ১০ই মে ১৯১৯ তখন একেবারে বিবাহ পর্ব সমাধা করিয়া যাইবেন। চন্দ্র সিংহজী কিছু জ্যোতিষী বিদ্যা জানিতেন। তিনি বিচার করিয়া বলিলেন,''এই বিবাহ লগ্নটি মোটেই শুভ হইবে না।'' কিন্তু জুঁঝার সিংহজী তাঁহার কথায় কোন গুরুত্ব দিলেন না। তিনি তাহার নিজের ইচ্ছাই বলবৎ রাখিলেন।

যথাসময়ে বিবাহের দিনটি আসিয়া গেল। মহা জাঁকজমকের সঙ্গে বিবাহ অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। এই সময়ে দুইটি অশুভ সংকেত দেখা গেল। অগ্নিসাক্ষী করিয়া যখন পণ্ডিতজী কনের হস্তটি বরের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য হাত মিলাইতে যাইবেন, তখন জুঁঝার সিংহজীর শরীরে অত্যন্ত তেজে জ্বর আসিল। ইহার পরেই যখন বর ও বধূকে অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করিতে হইল তখন কনের মাথার চূড়ার উপরের অংশটি খুলিয়া রূপার গলার কাছে ঝুলিতে লাগিল। এইসব অশুভ সংকেত সত্ত্বেও বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ পর্ব খুব ধূম-ধামের সহিতই সম্পন্ন হইল। বিবাহের একদিন পরেই কন্যার শ্বশুরালয়ে যাইবার নিয়ম। কিন্তু চন্দ্রনাথজী পিতার কার্য্য করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিয়াছেন এবং রূপা তাঁহার অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী। তাই তিনি স্নেহবশতঃ নির্দিষ্ট দিনে না পাঠাইয়া আরও তিনটি দিন বর-কনেকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং তিন দিনই সমানভাবে উৎসব চলিতে লাগিল। জুঁঝার সিংহজী যখন বলিলেন যে, তাহার ছুটি শেষ হইতে আর বেশীদিন বাকি নাই, তখন বরযাত্রীদের যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল। এদিকে কনের পাণিগ্রহণের সময় জুঁঝার সিংহজীর যে জ্বর আসিয়াছিল, তাহা কিন্তু এই উৎসব চলাকালে আরও বৃদ্ধি পাইতেই ছিল। তাহারা যখন বালা গ্রামে আসিয়া পৌঁছাইলেন তখন জ্বরের প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। তিনি বুঝিলেন যে ছুটি ফুরাইতে আর বেশী দিন বাকি নাই, কিন্তু তাহার এই শারীরিক অবস্থায় তাহার পক্ষে যাওয়াও সম্ভব নয়। তিনি বিলাড়া যাইয়া তাহার সঙ্গী অশ্ববাহিনী সেনাদের তার করিয়া ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করিলেন। অসুস্থ শরীর লইয়া এইসব পরিশ্রম করিবার জন্য তিনি যখন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি একেবারেই শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া পরিবারের সকলেই খুব চিন্তিত হইলেন। সর্বাপেক্ষা চিন্তিত হইলেন রূপা বাইসা, যিনি এখন পর্য্যন্ত স্বামীর মুখও দর্শন করেন নাই। রূপার অবস্থা অনুভব করিয়া তাহার মেজ জা ভুরকঁৱর রূপার হাতে এক গ্লাস জল দিয়া তাহাকে স্বামীর গৃহে পাঠাইয়া দিলেন যাহাতে রূপা একান্তে তাহার সহিত কথা বলিতে পারে। কিন্তু রূপা গিয়া দেখিলেন যে তাহার স্বামী আপাদমস্তক ঢাকিয়া শুইয়া আছেন। তখন রূপা জলের গ্লাসটি পালঙ্কের পাশে রাখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিলেন। ইহাই ছিল রূপার তাহার স্বামীকে একান্তে দেখা এবং শেষ দেখা।

বিবাহের পনের দিন পরে জুঁঝার সিংহজী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। পুরো-পরিবার নিদারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। .....ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

গীতা ভাবনা

(২৫)

যেসব কর্মফলবাদী বা যজ্ঞবাদী বেদোক্ত কর্মের প্রশংসা করেন এবং স্বর্গফলজনক কর্ম ছাড়া আর কিছুই নেই বলে মনে করেন, তাঁরা কামনাযুক্ত ও স্বর্গপ্রেমী। তাঁরা ভোগৈশ্বর্য লাভের জন্য ক্রিয়াকলাপের প্রশংসা করেন। এসব আপাত মনোরম পুষ্পিত বাক্য। এতে যারা মুগ্ধ হন এবং ভোগৈশ্বর্যে আসক্ত হন তাঁদের শুদ্ধা বুদ্ধি কখনো স্থির হয় না। বেদকে এভাবে পুষ্পিতবাক্য বলা অবশ্যই উপেক্ষা প্রদর্শন। এরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ স্বর্গকামীদের বুদ্ধি আপাত মনোরম। তাই অর্জনুকে নিষ্কাম হয়ে ঈশ্বরার্থ কর্ম করতে বলা হয়েছে। যোগক্ষেমের আশঙ্কা রহিত ও অপ্রমত্ত হতে বলা হয়েছে —

'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্য বিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ।।
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভেগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।।
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।'

(গীতা ২/৪২-৪৪)

বেদের বিধিবাক্যগুলি অর্থবাদের দ্বারা পুষ্পিতার্থক। এরূপ মতবাদে বিশ্বাসী কর্মকাণ্ডীরা স্বর্গপ্রাপ্তি জনক কর্ম ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। আপাত মনোহর এসব প্রশংসাবাক্য ভোগ ঐশ্বর্যে প্রযুক্তদের সমাধি হয় না। দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাদি দ্রব্য দানকে যজ্ঞ বলে। যজ্ঞ হল পুষ্প এবং দেববিজ্ঞান হল ফল, অথবা তারা দেবতা ও অধ্যাত্মবাদ। 'পুষ্পিতম্ বাচম্' বলে কর্মকাণ্ডীদের প্রতি, বিশেষতঃ যজ্ঞের প্রতি গীতা নিন্দাবাদ করলেও কথাটা বেদের কথারই প্রতিধ্বনি। পুষ্পফলরহিত বাক্য বলতে অর্থহীন বেদবাক্যকে বোঝান হয়েছে ঋক্সংহিতার ১০/৭১/৫ মন্ত্রে। গীতা যেভাবে অধ্যাত্মবাদে জোর দিয়েছে সেভাবেই নিরুক্তে মন্ত্রটির ব্যাখ্যা আছে (নিরুক্ত ১/৩/৯/৬)। আমরা অমরেশ্বর ঠাকুরকে অনুসরণ করে ব্যাপারটা বোঝাচ্ছি —'যজ্ঞ, দৈবত এবং অধ্যাত্ম এই তিনভাগে বেদকে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ বেদবাক্যের অর্থ বা তাৎপর্য হইতেছে যজ্ঞ, দেবতা এবং আত্মাকে বুঝাইতে। পুষ্প পূর্বে, পরে ফল; যজ্ঞপরিজ্ঞান পূর্বে, পরে দেবতাপরিজ্ঞান; কাজেই রূপক কল্পনায় পুষ্প = যজ্ঞ (যজ্ঞপরিজ্ঞান), ফল = দৈবত (দেবতাপরিজ্ঞান)। যাঁহারা অভ্যুদয়রূপ ধর্মের আকাঙ্ক্ষা করেন, দৈবতই তাঁহাদের ফল অর্থাৎ দেবতা পরিজ্ঞান হইলে, দেবসাযুজ্য লাভ হইলেই তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন। যাঁহারা মোক্ষরূপ ধর্মের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা দেবতা পরিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত হয়েন না, দৈবত বা দেবতা পরিজ্ঞানকে তাঁহারা ফল মনে করিতে পারেন না, অধ্যাত্ম বা আত্মজ্ঞান তাঁহাদের ফল, দৈবত বা দেবতা পরিজ্ঞান আত্মজ্ঞানলাভের সোপানমাত্র। কাজেই তাঁহাদের নিকট দৈবত বা দেবতা পরিজ্ঞান = পুষ্প, অধ্যাত্ম বা আত্মজ্ঞান = ফল'। প্রকৃতপক্ষে বেদের কথাটাই অন্যভাবে গীতা ব্যক্ত করেছে।

বেদের আপাত নিন্দার অন্তরালে যে বক্তব্যটি উপস্থাপিত হয়েছে তা হল - প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞ শব্দব্রহ্মকে ভেদ করে পরব্রহ্মের বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন। ভূমানন্দেই সকলকে যেতে হবে, কেবল কর্মেই আবদ্ধ থাকলে চলবে না। বেদের প্রকৃত তাৎপর্য না বুঝে খালি আবৃত্তি করলেই হবে না বা জটিল কর্মকাণ্ডের জাল বুনলে হবে না, তত্ত্ব সাক্ষাৎ করতে হবে। বেদ অধ্যয়ন, দান, তপস্যা প্রভৃতির দ্বারা পরতত্ত্বকে জানা যায় না একথা একাদশ অধ্যায়েও ভগবান বলেছেন —

'নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্যং এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।।'

(গীতা ১১/৫৩)

বেদের দ্বারা পরব্রহ্মরূপী কৃষ্ণের বোধ হয় না বটে কিন্তু সদ্গুরুর কাছে বেদের প্রকৃত তত্ত্ব জানলে বেদের দ্বারাই মৃত্যু অতিক্রম করা যায় (গীতা ১৩/২৪-২৬)। ঋষিরা ছন্দের দ্বারা, ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা বেদ তত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন। (গীতা ১৩/৫)

বেদের তথাকথিত চর্বণার দ্বারা বা বেদনহীন যজ্ঞের দ্বারা ব্রহ্মবোধ সম্ভব নয় — এই প্রসঙ্গেই বেদনিন্দা এসেছে গীতায়। শুধু বেদমন্ত্র জানলেই হবে না, অক্ষরকে পরমাকাশে দেখতে হবে, যার সেটাই হল না সে বেদ দিয়ে কি করবে? দীর্ঘতমা ঋষি ঋক্মন্ত্রেই একথা উচ্চারণ করেছিলন—

'ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃবা করিষ্যন্তি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে।।'

(ঋক্ সং ১/১৫৪/৩৯)

বাকের চারটি পদের মধ্যে তিনটিই অনির্বচনীয় বলে ব্রহ্মবিদ্ না হওয়া পর্যন্ত বেদের রহস্য জানা অসম্ভব। একদল বেদের তত্ত্বকে দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না কারণ

'নিন্যাবচাংসি' বোঝার ক্ষমতা চাই (ঋক্ সং ১০/৭১/৪)। এভাবে দেখলে বেদনিন্দার ব্যাপারটা অনেকটা স্পষ্ট হবে। বেদের উপনিষদ্ ভাগেও যজ্ঞের নিন্দা বলে বলা হয়েছে - 'প্লবাহ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা'। আসলে ধ্যানতন্ময়তার উপরে জোর দেবার জন্যই নিন্দা।

বৃহস্পতি ঋষি ঠিকই বলেছেন- (ঋক্ সং ১০/৭১/৫) বেদের অর্থ না জানলে সে তো ভারবাহী হয়ে পড়বে। যেখানে অগ্নি থাকেনা অথচ শুষ্ক কাঠ থাকে, সেখানে আগুন জ্বলবে কিভাবে? বেদবিদ্ হতে গেলে সৃষ্টি থেকে উজিয়ে যেতে হবে পরমাকাশে। একটা রূপকে বেদবিদ্দের অনুসন্ধানের ধারাটা বুঝিয়েছে গীতা —

'ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থম্ প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ।।

(গীতা ১৫/১)

গীতার বেদমূল অশ্বত্থ কঠোপনিষদে (৩/১) ঠিক এভাবেই এসেছে। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বেও ব্রহ্মবৃক্ষের কথা এসেছে। শঙ্করের ব্যাখ্যা একটু অন্যরকম হলেও বেদবিদ্-এর কথা গীতায় যেখানে যতবার এসেছে তার সমন্বয় করেই অর্থ করতে হবে।

আমরা অনির্বাণের ধারায় বেদ ও গীতার মধ্যে গাভীর সম্পর্ককে পেয়েছি। সেই সম্পর্ক অতি নিবিড়। আসলে তথাকথিত যজ্ঞবাদকে গীতা সহ্য করেনি বলে যজ্ঞের নতুন সাঙ্কেতিক ব্যাখ্যা দিয়েছে এবং তার ফলে আপাতবিরোধ এসেছে বলে মনে হয়। গীতার যজ্ঞবাদ এবং তার স্বরূপ স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করব। *..ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌগিক চেতনায় শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব

বিংশ পর্য্যায়—

শ্লোক :— *স নাভি কমলে বিষ্ণোঃ স্থিতো ব্রহ্মা পজাপতিঃ*
দৃষ্ট্বা তাবসুরৌ চোগ্রৌ প্রসুপ্তঞ্চ জনার্দ্দনম্।।৪৯
তুষ্টাব যোগনিদ্রাং তামেকাগ্রহৃদয়স্থিতঃ।
বিবোধনার্থায় হরের্হরিনেত্র কৃতালয়াম্।।৫০।।

শব্দার্থ :— স্থিতো - অবস্থিত; তাবসুরৌ - সেই অসুরদ্বয়; প্রসুপ্তঞ্চ - এবং নিদ্রিত; তুষ্টাব - স্তব করলেন; বোধনার্থায় - জাগরণের নিমিত্ত; নেত্র কৃতালয়া - চক্ষু আচ্ছন্ন করিয়া; তেজসঃ - তেজ স্বরূপ।

বাংলা শ্লোকার্থ :— বিষ্ণুনাভিপদ্ম-স্থিত ব্রহ্মা উগ্র অসুরদ্বয়ের উপস্থিতি এবং বিষ্ণুকে নিদ্রামগ্ন দেখে তাঁর নিদ্রা ভঙ্গের জন্য বিশ্বের স্থিতি সংহার কারিণী বিশ্বেশ্বরী মহামায়া, যিনি যোগনিদ্রারূপে বিষ্ণুনেত্র আচ্ছন্ন করে রয়েছেন, তাঁর স্তব করতে লাগলেন।

যৌগিক ব্যাখ্যা :— যোগ চেতনায় বলা যায়, সংস্কার স্বরূপ অসুরদ্বয় মধুকৈটভকে প্রতিরোধ করার জন্য রজোগুণী ব্রহ্মা নির্লিপ্ত মন প্রাণ শক্তিরূপ বিষ্ণুর শরণ নিতে গিয়ে দেখেন যে ভগবান বিষ্ণু যোগনিদ্রায় মগ্ন। যোগনিদ্রাস্বরূপা স্বয়ং মহামায়া বিষ্ণুস্বরূপ প্রাণকে জগৎ ব্যাপারে উদাসীন করে রেখেছেন, তাই পদ্মযোনি ব্রহ্মা বা মন, প্রাণ শক্তির জাগরণের জন্যে সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিণী মহামায়ার আবির্ভাবের জন্য কাতর ভাবে স্তব করতে লাগলেন। এক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মহামায়াকে বিষ্ণুর যোগনিদ্রা রূপিণী বলা হয়েছে। চক্ষু প্রাণের বহিঃপ্রকাশের স্থান অর্থাৎ, চক্ষুর বাতায়ন দিয়ে চৈতন্যের প্রকাশ পায়। প্রাণ অন্তর্মুখী হলে জগৎ বিষয়ে নিরাসক্ত ভাব চক্ষুতেই পরিস্ফুট হয়। প্রাণ মহামায়ার প্রভাবে সাময়িকভাবে মাতৃযোগ জনিত আনন্দে তন্ময় হলে পরে ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, নিন্দা-স্তুতি ইত্যাদি দুনিয়ার সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ উদাসীনবৎ অবস্থায় বিরাজ করে।

মনুষ্যরূপী পার্থিব জীব তার স্থূল চেতনা বিশিষ্ট পার্থিবগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ; সাধনার দ্বারাই তারা যোগনিদ্রা স্বরূপা মহামায়াকে জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী রূপে উপলব্ধি করতে পারে। মহামায়ার উপলব্ধিতে তখনই সাধকের জীবত্বের অবসান হয়।

নাভিকমল বা মণিপুর তেজস্তত্ত্বের কেন্দ্র। এই নাভিচক্র থেকে সকল পার্থিব ভাবের উদয় হয়। যতক্ষণ জীবের মধ্যে সংস্কারের বীজ নিহিত থাকে ততক্ষণ মন নাভিকমলের সম্পর্ক ত্যাগ করতে পারে না। তখন পার্থিব চেতনায় বিপর্য্যস্ত মন পরিত্রাণের আশায় আজ্ঞাচক্রস্থিত যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া, যিনি প্রাণকে মুগ্ধ করে রেখেছেন, তাঁর শরণ নেয়। মহামায়া প্রাণশক্তিকে জাগরিত করলেই জীবত্বের সংস্কাররূপী অসুরদের হতবল করা সম্ভব। *.....ক্রমশঃ*

—অধ্যাপক শ্রীহরপ্রসাদ রায় (অবসরপ্রাপ্ত)
বহরমপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১০)

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনম্।
বিন্দুনাদকলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৯

চৈতন্যং, শাশ্বতং, শান্তং, ব্যোমাতীতং, নিরঞ্জনং, বিন্দুনাদকলাতীতং যৎ ব্রহ্ম, স এব গুরুঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৩৯

তিনি চৈতন্যস্বরূপ (চেতনাবিহীন জড়বস্তুর মত নহে, প্রমাণ প্রত্যক্ষভাবে বুঝা যায়, অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গে থাকিলে চৈতন্যের বৃদ্ধি হয়, পরন্তু জড়সঙ্গে থাকিলে চৈতন্যের হ্রাস হয়, ইহা প্রত্যক্ষীভূত হয়; তিনি শাশ্বত পুরুষ (অর্থাৎ তিনিই একমাত্র নিত্যপুরুষ, পরন্তু জড়বস্তু সমূহ তাঁহাতে গিয়া লয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, তাহারা অনিত্য (তাঁহার নিকট গেলেই ইহা বুঝা যায়); তিনি শান্ত (অর্থাৎ উৎপত্তি ও নাশের অধীন বলিয়া জড়বস্তু অশান্ত, উৎপত্তির পর নিম্নগতি হইয়া বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমশঃ নাশের মুখে যাইবার জন্য গতিশীল অবস্থায় রহিয়াছে, সুতরাং সে শান্ত কি করিয়া হয়? পরন্তু ব্রহ্মের উৎপত্তিও নাই এবং নাশও নাই, সুতরাং তিনি সদাই শান্ত); তিনি ব্যোমাতীত (অর্থাৎ ব্যোমতত্ত্ব পর্য্যন্ত জড়ের গতিবিধি আছে, সে পদ অতিক্রম করিয়া নিরঞ্জন-পদে আসিলে, জড়ের জড়ত্ব ঘুচিয়া সে সূক্ষ্মব্রহ্মে মিশিয়া যায়, সুতরাং নিরঞ্জন পদে জড়ের সম্পর্ক নাই, সুতরাং যতক্ষণ চিন্তা (যাহা জড় বিষয় সম্পর্কে হইয়া থাকে) রহিয়াছে, ততক্ষণ বুঝিতে হইবে যে, জড়ের সম্পর্ক ঘুচাইয়া জীব নিরঞ্জনপদে স্থিতি সম্পন্ন হয় নাই; তিনি নিরঞ্জন পুরুষ (যেখানে অঞ্জনরূপ অর্থাৎ বিষয়সংস্কার রূপ মল নাই, উহাই নিরঞ্জনের রূপ); তিনি বিন্দুনাদকলাতীত (যতক্ষণ জীব নিম্ন জগতে আছে, ততক্ষণ অতি সূক্ষ্ম বলিয়া বিন্দুরূপে তাঁহার দর্শন হয়, তাঁহাতে গিয়া পৌঁছিলে, জীবের আত্মবিসর্জন হয়, তখন ব্রহ্মনির্দেশক বিন্দুও নাই, এবং আত্মবিসর্জন হেতু পরকীয় আত্মসত্তাও নাই); তাঁহাতে যাইবার জন্য গতিশীল অবস্থায় নাদরূপ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, তথায় পৌঁছিলে আর গতি নাই, সুতরাং নাদও নাই; সকল বস্তুই হ্রাস-বৃদ্ধির অধীন, তাঁহার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই, সুতরাং কলাতীত; এমত গুরুকে নমস্কার।।৩৯

স্থাবরং নির্ম্মলং শান্তং জঙ্গমং স্থিরমেব চ।
ব্যাপ্তং যেন জগৎ সর্ব্বং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪০।।

শান্তং তৎব্রহ্ম স্থাবরং (স্থাবররূপেণ স্থিতং); নির্ম্মলং (মলশূন্যভাবেন স্থিতং); জঙ্গমং (জঙ্গমরূপেণ স্থিতং); স্থিরং (গতিশূন্যভাবেন স্থিতং); যেন (তাদৃশপুরুষেণ) সর্ব্বং জগৎ ব্যাপ্তং, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ (সর্ব্বং ব্রহ্মময়ংজগতিত্যেবং প্রকাশয়তি)।।৪০।।

সেই শান্তব্রহ্ম এই জগতে স্থাবররূপে, মলশূন্যভাবে ও স্থিরভাবে আছেন, এতাদৃশ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষ সর্ব্বজগৎ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, তাদৃশ শ্রীগুরুকে নমস্কার।।৪০

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানমুৎপদ্যতে স্বয়ম্।
স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪১।।

যস্য স্মরণমাত্রেণ জ্ঞানং স্বয়ম্ উৎপদ্যতে, স এব সর্ব্বসম্পন্নঃ (গুরুঃ) তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।।৪১।।

জীব জগতে আত্মসত্তা হারাইয়াছে এবং পরসত্তাকে সে আত্মসত্তা বোধে দেখিতেছে। দেহ অবলম্বনে সে আসিয়াছে, সুতরাং ভাবিতেছে, বুঝি দেহই তাহার উৎপত্তির কারণ এবং আত্মসত্তা, সুতরাং সে দেহাত্মবাদী; সে কারণ দেহের নাশে তাহারও নাশ হইবে ইহাই সে বুঝিয়া থাকে, সুতরাং দেহরক্ষার্থে তাহার বহু যত্ন হইয়া থাকে। সে জন্য তাহার জ্ঞানলাভের চেষ্টা হয়, অর্থাৎ কিসে দেহ রক্ষা পাইবে, এবং কি উপায়ে সে দেহজনিত সুখোপভোগে তৃপ্ত থাকিবে, ইহারই জ্ঞানের জন্য সে সদাই ব্যস্ত হইয়া থাকে। পরন্তু দেহ নশ্বরবস্তু এবং কিছুতেই তাহাকে অবিনশ্বর করা যায় না, এবম্বিধ ধারণা কদাচিৎ কোন বুদ্ধিমানের হয়, তিনি বুঝিয়া থাকেন যে, দেহজনিত সুখোপভোগ পরিশেষে দুঃখেরই কারণ হয়; সুতরাং তিনি বুঝিয়া থাকেন যে, দেহ তাহার উৎপত্তির বা সুখের কারণ হইতে পারে না, সে কারণ তিনি নিজ উৎপত্তির কারণ অনুসন্ধানে বহির্গত হন। তিনি সদ্‌গুরুর নিকট আসেন, গুরু জীবের অন্তরস্থিত আত্মসত্তার পরিচয় করাইয়া দেন; তিনি দেখিতেছেন যে, প্রত্যক্ষদৃষ্ট কূটস্থব্রহ্মই তাঁহার উৎপত্তির কারণ, তদ্ধ্যানে থাকিলেই সর্বপ্রকার জ্ঞান আপনিই লাভ হয়; এমত গুরুকে নমস্কার।।৪১।। *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

পত্র নং (১)

ওঁ

১০ই জুন, ১৯৩৮ ইং
কাশীধাম

শ্রীমান ক্ষিতীশ - পরম কল্যাণীয়েষু,

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতেছি। যথা - সৃষ্টির প্রাক্কালে ব্রহ্মের অভ্যন্তরে স্পন্দন হয়। পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর স্বভাবতঃ ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হয়েন। তাঁহারা মায়া সংযুক্ত হইয়া আপনি আপন দেহ প্রাপ্ত হয়েন। এই মায়ার মলিনাবস্থাকে অবিদ্যা বলে। তন্মধ্যে তমঃশক্তি আবরণ শক্তি, রজঃশক্তি বিক্ষেপ শক্তি এবং সাত্ত্বিকী শক্তি প্রকাশ শক্তি। এই মলিনামায়া বা অবিদ্যা যেরূপ জীবের বন্ধনের হেতু হয়, বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকীমায়া সেইরূপ মোক্ষের হেতুভূত হইয়া থাকেন। চৈতন্যমায়া সংযুক্ত হইয়া আপনাকে যে-যে আকারে ভাবনা করেন, তখনই সেই সেই আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকেন। অগ্রে জীব সমষ্টি চিত্ত থাকেন, পরে সঙ্কল্প বলে ব্যষ্টিভাবে নানারূপ জীবত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে। চৈতন্যমায়া সংযুক্ত হইলে তাহা হইতে মন, অহঙ্কারাদি উৎপন্ন হয়। তখন তিনি আপনাকে ইন্দ্রিয় সংযুক্ত সূক্ষ্ম-দেহময় ভাবনাপূর্ব্বক তাহাই হইয়া পড়েন। অবিদ্যাবশে আত্মবোধশূন্য হইয়াই চৈতন্যের জীবত্ব প্রাপ্তি ঘটে। অগ্রে সূক্ষ্ম বা অতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হইয়া পরে আপনাকে জড় ভাবনা করেন। তিনি ক্রমান্বয়ে আপনাকে শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্ররূপে ভাবনা করিয়া তৎরূপে উৎপন্ন হয়েন। পরে আকাশতন্মাত্রে স্থিত হইয়া আপনাকে সূক্ষ্ম আকাশরূপে ভাবনা করায় আকাশ তত্ত্বের উৎপত্তি হয়।

এইরূপ সূক্ষ্ম আকাশতত্ত্বে স্থিত কল্পনা করিয়া সূক্ষ্ম বায়ুতত্ত্ব রূপে উৎপন্ন হয়েন। এইরূপে বায়ুতত্ত্বে স্থিত হইয়া সূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বরূপে এবং সূক্ষ্ম অগ্নিতত্ত্বে স্থিত হইয়া সূক্ষ্ম রসতত্ত্বরূপে এবং তাহাতে স্থিত হইয়া সূক্ষ্ম পৃথ্বিতত্ত্বরূপে উৎপন্ন হয়েন। পরে পঞ্চ সূক্ষ্ম ভূত বা মহাভূতের পঞ্চীকরণ যথা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চমহাভূতের প্রত্যেকটিকে সমান দুই ভাগ করিয়া প্রত্যেকটির এক অর্ধভাগ পৃথক রাখিয়া অপর অর্ধভাগগুলিকে সমান চারিভাগে ভাগ করিবে। পরে প্রত্যেকটির নিজ অর্ধাংশ এবং অপর চারিভূতের প্রত্যেকের অপর অর্ধাংশের এক চতুর্থাংশ মিলিত হইয়া পূর্ণ অংশ হইয়া এক একটি স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। তখন চৈতন্য বিরাট স্থূলদেহ ও বিরাট সূক্ষ্মদেহ যুক্ত হইয়া বিরাট-পুরুষ রূপে পরিণত হয়েন। তখন তিনি সঙ্কল্প দ্বারা আপনাকে বহু জীবরূপে কল্পনা

করিয়া ব্যষ্টিভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিত্ত লইয়া নানা আকারের জীব হইয়া পড়েন। অহঙ্কার মন হইতে আরম্ভ করিয়া স্থূল জড় ভাবাপন্ন সমস্ত জগৎই সমষ্টি চিত্ত দ্বারা কল্পিত হইয়া ঐ চিত্তেই স্থিত হয়। স্থূল, সূক্ষ্ম সমস্ত জগৎই মিথ্যা। এতৎ সমস্তই কল্পনা প্রসূত। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার সর্ব্বত্রই অস্তিত্ব থাকায় মিথ্যা বস্তুও সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু তত্ত্বতঃ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ বলিয়া কিছুই নাই। ব্রহ্ম জীবরূপ ধারণ করিয়া অবিদ্যাবৃত থাকিয়া নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া পড়েন এবং ক্রমান্বয়ে আরো আরো তমসাবৃত হইয়া নিজের জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি কল্পনা করিয়া দুরাবস্থাপন্ন হইয়া পড়েন। চিত্তের স্বচ্ছতা প্রযুক্ত অগ্রে যাহা কিছু কল্পনা করিয়াছেন তাহাই ঘটিয়াছে। এক্ষণে চিত্ত অত্যন্ত মলিন হওয়ায় আমি এই চিত্ত, আমার এই দেহ ইত্যাদি ভ্রমে পতিত হইয়া নানা চিত্তদোষে আপনাকে তত্ত্বদ্ভাবাপন্ন কল্পনা করেন। তখন আর তাহার ইচ্ছামাত্র কার্য্য হয় না। পরে তিনি কোন প্রকারে সাধু-মহাত্মা ও সদ্‌গুরু সঙ্গলাভ করিয়া কামনা-বাসনা বিদ্বেষাদি সমস্ত চিত্তদোষ ক্রমশঃ স্খলন পূর্ব্বক স্বকীয় পূর্ব্বরূপ ক্রমশঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজরূপ ব্রহ্মরূপে স্থিত হয়েন। চৈতন্যের পরিণাম বা পরিবর্ত্তন কদাচ হয় না। উহা কল্পনা মাত্র। চৈতন্য সদাই স্বকীয় স্বভাবে স্থিত আছেন। তিনি নিত্য মুক্ত স্বভাব। জীবের চিত্ত

যখন বিশুদ্ধ সত্ত্বময় হয়, তখন আত্মবোধ স্বভাবতঃ উদ্ভাসিত হয়। তখন তাহার সংকল্পবলে কার্য্য হইয়া থাকে। চিত্তের দ্বারাই চিত্তমল স্খলিত করা যায়। অগ্রে অষ্টাঙ্গ যোগ, ভক্তি যোগাদি দ্বারা চিত্তমলের অপসারণ হয়। পরে মোক্ষ শাস্ত্র অধ্যয়ন, আত্ম-অনাত্ম বিচার, তত্ত্বোপদেশ শ্রবণাদি দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হয়। চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়া স্বয়ং প্রাকাশ আত্মা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিয়া থাকেন। ইহাই জীবের কল্পিত মোক্ষ। চৈতন্যের বন্ধন, মোক্ষ উভয়ই কল্পিত। আপনাকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, আত্মধ্যানাদি ভবরোগের প্রসিদ্ধ ঔষধ। তখন অদ্বৈতভাবে জীব প্রতিষ্ঠিত হয়েন। তখন তাহার দেহ থাকিতেও নির্ব্বাণমুক্তি হয়। সৃষ্টির পর সেই চৈতন্যের সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে যে যে ভাবে কল্পনা করিয়াছেন, এখনও জীব সেইভাবে দেখিতেছেন। মূল সমষ্টি চিত্তের কল্পনা বলে এখনও জীবের জগৎভ্রান্তি হইতেছে। ইহাই নিয়তি। এইরূপে নিয়তিও জগতে ক্রীড়া করিতেছে। পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা জীব নিজমুক্তি নিজেই সম্পাদন করেন। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

পুনঃ — কর্ম্ম ও কর্ম্মফল

সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ দ্বারা কর্ম্মকৃত হয়। ঐ উভয় দেহের উৎপত্তি যখন অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশে হইয়া থাকে এবং দেহই যখন মিথ্যা,কর্ম ও কর্মফলও মিথ্যা। তবে ব্যবহারিক জগতে পূর্ব সঙ্কল্প বলে সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। যতক্ষণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান থাকে, জীব কর্মফল ভোগ করিয়া থাকে। জ্ঞানোদয়ে সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয়। তবে প্রারব্ধ কর্মফল অর্থাৎ যে সকল কর্মফল দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার ফলভোগ দেহান্ত পর্যন্ত হইয়া থাকে, এরূপ কথিত হয়। কিম্বা জ্ঞানোদয়ে জীব ঐ সকল ফল নির্লিপ্ত ও স্থিরভাবে ভোগ করেন। উহা ভোগই নহে। ইহাই কর্মফলের মীমাংসা। কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিলে আর তজ্জন্য বন্ধন হয় না, ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

ইতি —

শ্রীকিশোরী মোহন

('বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)

গুপ্তযোগী ভূপতি মহারাজ

(১৪)

শ্রীসুরেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়রী থেকে —

'কৃ বা বৈধী সৃষ্টিঃ পততি যদি দৃষ্টিস্তব শিবে।' — অর্থাৎ তাঁহার কৃপার সঞ্চার হলে অঘটন ঘটিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীভূপতিনাথের আশীর্বাদ মাত্রই শিশু থেকে বৃদ্ধ যোগ সমাধিতে স্থিত হতে পেরেছে।

আত্মারাম শ্রীশ্রীভূপতিনাথ সমাধিতে মগ্ন। তাঁর সেই বিরল দর্শন বিস্ময়কর পরদশা ভক্ত-শিষ্যগণ নীরবে দেখছে। অকস্মাৎ তিনি চোখ খুললেন এবং সামনে যাকেই দেখলেন, তার প্রতি বরাভয় ডান হাত তুলে উদাত্ত কণ্ঠে বলছেন :

''তুমি আমার নিকট বর চাও! কি চাও বল, তোমাকে আমি ব্রহ্মপদ অবধি দিতে পারি। চাও, চাও! কি চাও বল !''

ভয় ব্যাকুল চিত্তে ভক্ত কেবল তাঁর করুণাই প্রার্থনা করেছে। এই করুণার অমৃতধারা ভক্ত-অভক্ত, দীন-দরিদ্র সবার প্রতি সমভাবে বর্ষিত হোত। পাপী বা পুণ্যবানের ভিন্নতাবোধ তাঁর ছিল না। ''সর্ব্বং খলিদ্বং ব্রহ্ম'' — এই নিশ্চয়জ্ঞানে তাঁর শুভাশুভ, ত্যজ্য-গ্রাহ্য, হেয়োপাদেয় সকলই একাকার ব্রহ্মরূপ হয়েছিল।

যোগের পরিভাষায় আমাদের মাথাটা পিছন দিকে হেলালে যেখানে টোল পড়ে, ঐ জায়গা থেকে দু-ইঞ্চি ভিতর দিকে ঢুকে গেলে, ওখানে একটি, মন্দির মতো দেখতে পাওয়া যাবে। সন্তদের সাধন মতে 'উল্‌টা কুঁয়া'। ঐ মন্দিরই জীবের বাসস্থানে 'আজ্ঞাচক্র'। ঐখানে পৌঁছালে, ওখান থেকেই জীব তুমি অমৃত পথে যাত্রা করতে পারবে। তার আগে নয়। এখন তুমি মন্দিরের বাইরে আছো। এমনকি একথাও বলা চলে, তুমি 'মন্দির' থেকে বহুদূরে আছো। এখন প্রথম কাজ হবে জীবের, ঐ মন্দির অবধি পৌঁছানো, তার পরের রাস্তাটুকু সবটাই সদ্‌গুরু কৃপা। ঐ মন্দির অবধি পৌঁছাবার অনেক রাস্তা মহাত্মারা ব্যক্ত করেছেন — ধ্যানযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, বিহঙ্গমযোগ, পীপিলিকাযোগ আরও কত যোগ। কিন্তু শ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে সহজ যোগ, গুরুপূজা। এই যোগের দ্বারা সহজেই নবদ্বার অতিক্রম করে দশম দ্বারে পৌঁছে যাওয়া যায়।

ঋজুবিমর্শিণীকার বলেছেন —''সমস্ত জ্ঞেয় পদার্থের চিদ্‌ভূমিতে বিশ্রান্তিই পূজা'' এই বর্ণনার সঙ্গে ''গুরুকে আপন আত্মারূপে ভাবনা করাই পূজা। নির্বিকল্পক মহাকাশে আদর পূর্বক আত্মনিবেদন করাই পূজা।'' ভগবান শঙ্করাচার্য্য শিবমানস পূজা স্তোত্রের একটি শ্লোকে এই ভাবের কিঞ্চিৎ আভাস দিয়েছেন —

'আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণাঃ শরীরং গৃহং,
পুজাতে বিষয়ভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্ব্বা গিরো,
যদ্ যৎ কর্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো তবারাধনম্।।'

হে শঙ্কর! আমার আত্মা তুমি, আমার বুদ্ধি তোমার শক্তিরূপিণী পার্বতী, আমার প্রাণসকল অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান ইত্যাদি তোমার সহচর স্বরূপ, আমার শরীরই তোমার গৃহ বা মন্দির, আমি যাকে নিদ্রা বলে বর্ণনা করি বস্তুতঃ তাহা তোমাতে সমাধিস্থিতি, আমার পদসঞ্চার তোমার প্রদক্ষিণ স্বরূপ এবং আমি যাহা কিছু শব্দ প্রয়োগ করি, সে সব তোমারই স্তোত্র — সংক্ষেপে বলা চলে আমি যখন যে কর্ম করি সবই তোমার আরাধনা।

হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, 'গুরুপূজা', কেবলমাত্র এই যোগের দ্বারা জীব পরম ধামের দিকে যাবার রাস্তা খুঁজে পাবে। মন্দিরের কথা আগে বলেছি, ঐখান থেকেই জীব তুমি সদ্‌গুরু কৃপা বা সাহায্য, সদ্‌গুরুর কাছ থেকেই পাবে। কিন্তু তার আগের রাস্তাটুকু অর্থাৎ মন্দির অবধি পৌঁছাবার রাস্তা সেখানে গুরুর কোন হাত নেই। এই জন্য যিনি সাচ্চা গুরু বা সিদ্ধ মহাযোগী, তিনি, জীব ঐ রাস্তাটা অতিক্রম করেছে কিনা আগে দেখবেন, তারপরে আণবমলের কথা আসছে।

কেউ একজন এই রাস্তা অতিক্রম করেছে কিনা সেটা কে জানবে? জীব তো নিজে জানতে পারবে না। একমাত্র ত্রিকালজ্ঞ সত্যদর্শী যিনি তিনি একজনকে দেখা মাত্রই বা না দেখলেও কে কোথায় এই রাস্তা অতিক্রম করেছেন তা জানতে পারেন, তখন তিনি তাকে সেধে নিজে উপযাচক হয়ে বরণ করেন।

শ্রীশ্রীভূপতিনাথ তাঁর এক শিষ্যাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ''আমার যারা ভক্ত, শিষ্য তারা সকলেই পূর্বজন্মে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দর্শন পেয়েছিলেন।'' আমাদের ক্ষমতা সীমিত, অবতারের ক্ষমতার কোন সীমা পরিসীমা নেই। বিগতজন্মে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের দর্শন মাত্রেই 'মন্দিরে' পৌঁছে যাবার রাস্তা তারা পেয়ে গিয়েছে। সেইটি দেখে আমার মধ্যে গুরুসত্তা জাগ্রত হওয়াতেই আশীর্ব্বাদ মাত্রই শিশু থেকে বৃদ্ধ পরমযোগ সমাধিতে তৎক্ষণাৎ আরূঢ় হয়েছে। অবতার বরিষ্ঠ সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতিরেকে স্বাভাবিক ক্রমজ্ঞান আয়ত্ত হতে পারে না। ক্রম-সিদ্ধি নামক গ্রন্থে আছে —

'গুর্বায়ত্তং ক্রমজ্ঞানমাজ্ঞাসিদ্ধিকরং পরম্।
ক্রমজ্ঞানাম্ মহাদেবি ত্রৈলোক্যং কবলীকৃতম্।।'

— অর্থাৎ, ক্রমজ্ঞান সদ্‌গুরুর অনুগ্রহ সাপেক্ষ। ইহাই যোগীর পক্ষে পরম আজ্ঞা সিদ্ধির সম্পাদক। ক্রমজ্ঞান লাভ করলে ত্রৈলোক্য বশীভূত হয়। অতএব আমরা যাঁহাকে মহাশক্তির শ্রেষ্ঠ আরাধক এবং পূজা রহস্যবিদ্ আদর্শ পুরুষ বলে বর্ণনা করি তিনি ক্রমসিদ্ধ মহাযোগী শ্রীশ্রীভূপতিনাথ। তিনি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ এবং পরমেশ্বরের সঙ্গে অভেদজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য শক্তির অধিকারী। মহাশক্তির সর্বোত্তম উপাসকের ইহাই স্বরূপ বর্ণনা।

—শ্রীসজল কান্তি ভট্টাচার্য্য

মহদ্‌জ্যোতি

বিশ্বলয়ে করছ খেলা,
ওগো বিশ্বপতি —
আকাশ ভরা তারার মেলা,
তোমায় করে আরতি।।
নিশীথের চন্দ্র উঠি,
তোমারি পায়ে পড়ছে লুটি

দিবসের তরুণ তপন,
তব পানে তীব্রগতি।।
মলয় পবন বহে,
তোমারই পরশ লহে
নদী আর সাগর জলে
ধুয়ে দেয় চরণ দুটি।।

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীগুরুদাস আশ্রম

আশ্রম সংবাদ

১১-২২শে জানুয়ারী — এই কয়েকদিন পুষ্কর নিবাসী সন্ত শ্রীশ্রীটাটবাবা অখণ্ড মহাপীঠে অতিবাহিত করেন। আশ্রম নিবাসী ভক্তবৃন্দ তাঁর পূত সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য লাভ করে ধন্য হন।

১৫ই জানুয়ারী — শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের পূজা ও যজ্ঞ। প্রতি বৎসরের ন্যায় হোটর আশ্রমের কিছু ছাত্র-ছাত্রীরা এইদিন অখণ্ড মহাপীঠে উপস্থিত ছিল। তাদের প্রত্যেককে শ্রীশ্রীমা প্রদত্ত উপহার প্রদান করা হয়। দ্বিপ্রহরে আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে হোটরের শিশু ও বালিকারা নিবেদন করে প্রাদেশিক নৃত্যের উপর একটি মনোরম নৃত্যগীতানুষ্ঠান। এরপরে পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীরাও ভক্তিমূলক বিষয়ের উপর নৃত্যপরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমায়ের উপস্থিতিতে এইদিন রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সুব্রত সেনগুপ্ত।

১২-১৫ই ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমা কয়েকজন গুরুভ্রাতা ও ভগিনী সহিত পুরী আশ্রম পরিদর্শনে যান। শ্রীশ্রীমা সেখানে অবস্থান কালীন সিদ্ধেশ্বরী মন্দির, অদ্বৈত ব্রহ্ম আশ্রম ও পঞ্চলিঙ্গেশ্বর মন্দির দর্শন করেন। বালিগোয়ালির 'ডিভাইন লাইফ সোসাইটি' ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীমার প্রবচনের একটি অনুষ্ঠান আয়োজিত করে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী — যোগদা সৎসঙ্গ সোসাইটির মোহন্ত স্বামী শুদ্ধানন্দজী অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আসেন। উপস্থিত ভক্তবৃন্দ শ্রুতিমধুর সঙ্গীত শ্রবণে ও সৎসঙ্গে এইদিন সন্ধ্যাটি অতিবাহিত করেন।

২৩শে ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান ইমতিয়াজ আলি ভাইসাব এইদিন সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে আশ্রমে এসে কিছু সময় অতিবাহিত করেন।

২৮শে ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমা আশ্রমস্থ কয়েকজন সহ 'হোটর আশ্রম' পরিদর্শনে যান। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধ্বী সুচেতানন্দময়ী ও সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী। আশ্রমের ব্রহ্মচারিণী ও শিষ্যাগণও এক-এক করে শ্রীশ্রীমাকে হার্দিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

শ্রীশ্রীমা শিশুদের আবাসস্থল পরিদর্শন করেন ও তাদের প্রত্যেককে নিজ হাতে চকোলেট প্রদান করেন। তৎপরে নিকটস্থ গ্রামের কিছু দর্শনার্থীরা শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম জানান। পরিশেষে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

৭ই মার্চ — শিবরাত্রির সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে একান্তে শিব পূজা করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞগৃহে শ্রীযজ্ঞনারায়ণদা শিবরাত্রির যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন।

২০শে মার্চ — আধ্যাত্মিক সভার ১৮তম পর্বে 'ঈশোপনিষদ্ ও কেনোপনিষদ্ প্রসঙ্গে' ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডাঃ বরুণ দত্ত।

২৩শে মার্চ — দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্যে শিশুশিল্পী অশোকা বসু ও শ্রদ্ধা দাসগুপ্তের নৃত্যের পর পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের শিষ্যাবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য অনুষ্ঠিত হয়, যা অতি মনমুগ্ধকর হয়েছিল।

২৫শে মার্চ — শ্রীশ্রীমায়ের আগমন হেতু বহুভক্তবৃন্দ এইদিন গুরুভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্র সেঠিয়ার গৃহে সমবেত হয়েছিলেন। সঙ্গীত ও সৎসঙ্গে সন্ধ্যা নির্বাহের পর ভক্তবৃন্দ পরিতৃপ্তি সহকারে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান

বুদ্ধ পূর্ণিমা — ২১শে মে, শনিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ১৯শে জুন, রবিবার
গুরু পূর্ণিমা — ২৬শে জুলাই, মঙ্গলবার

कृपासिंधु महर्षि देवराहा बाबा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

उत्तर भारत में तीर्थ परिक्रमा के अन्तराल में एक किंवदंती प्रचलित है कि वाल्मीकि मुनि ने परवर्त्तीकाल में गोस्वामी तुलसीदास के रूप में जन्म-ग्रहण किया था। पुनराय ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के संदर्भ में भी यह लोकोक्ति है कि वे साक्षात् वाल्मीकि हैं। किन्तु आत्मज्ञान की आत्मज्योति की प्रभा में परमबोध द्वारा एवं साधनकाल में प्रत्यक्ष अनुभूत घटना सम्मुख होने पर यह जान पायी कि ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा एवं गोस्वामी तुलसीदासजी एक ही व्यक्तित्व नहीं है। तथा वाल्मीकि मुनि भी अन्य स्वतंत्र एक महान व्यक्तित्व थे। सद्गुरु परम्परा के दिव्य आलोक में ज्ञात हुआ कि गोस्वामी तुलसीदासजी थे ब्रह्मर्षि 'वशिष्ठदेव', जो पुराणों के विशेष अमर-चरित्र एवं एक अनन्य भगवत लीला संघटक ऋषि, जो 'योगवाशिष्ठ' रामायण के मुख्य पात्र थे। इधर ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के पावन सान्निध्य एवं उन के दैवकृपा बल से यह जान पायी कि श्री देवराहा बाबा है एक प्राचीन दिव्य पुरुष ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मर्षि 'सनक'; इन ब्रह्मा-पुत्र सनक ऋषि ने वशिष्ठदेव के तपोबल से भगवत रामलीला के भगवन नारायण के पूर्णकला के परिपूर्ण का परिपूर्ण आवेश अवतार स्वरूप में श्रीरामचन्द्र रूप में धरा पर अवतीर्ण होकर भगवत्लीला में अंशग्रहण किया था। ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा है 'जगन्नाथ' तत्त्वाधिकारी एक विराट महात्मा। इस के अतिरिक्त प्रज्ञा के आलोक से यह ज्ञात हुआ है कि महर्षि वाल्मीकि हैं, प्राचीन कालीन 'मेधातिथि' ऋषि। जिनके यज्ञकुण्ड से एक दिव्यांगना आविर्भूत हुई थी एवं मेधातिथि ने उस कन्या का नाम रखा 'अरुंधती'। एवं मेधातिथि की इस दुहिता अरुंधती के संग ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का विवाह संपन्न हुआ।

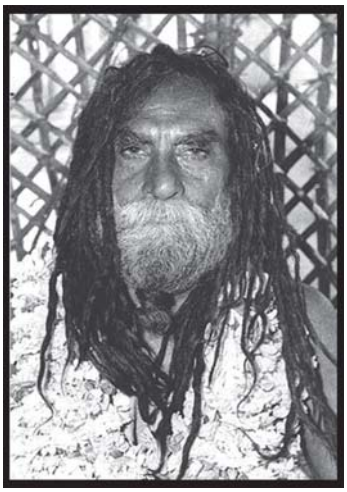

साक्षात् श्रीराम स्वरूप ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा के विषय में वर्णन के क्रम में जिस प्रकार सर्वप्रथम मेरे जीवन में उनका साक्षात्कार हुआ, वही प्रसंग मैं यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ–

वह था ई० १९८७; मैं अभी-अभी सॉल्टलेक वाले आवास पर आयी थी। देवताओं का आसन प्रतिष्ठित हुआ था। उस समय मेरी सेवा हेतु, एक मुसलमान औरत जिसका नाम हालिमा बीबी था, प्रतिनियुक्त थी। एकबार मैं प्रातःकाल जब अपने आसन पर ँश्रीश्री आद्यामाँ की पूजा कर रही थी, उस समय वह कुछ अपूर्व सहस्रमुखी जवापुष्प लेकर मेरे निकट आयी और बोली कि माँ की पूजा हेतु वे सारे पुष्प लायी है, मैंने पाया की वे फूल बिल्कुल ताजा एवं पवित्र रूप से परिष्कृत है। बिना कुछ सोचे समझे मैंने आत्मस्थ भाव में पूजन काल में ही उसके हाथों से उन पुष्पों को ग्रहण किया। तत्पश्चात् ँआद्यामाँ की पूजा संपन्न हुई। कई दिनों के पश्चात् मेरे उदर में असहनीय यंत्रणा आरम्भ हुई। उस समय भी मैं यह नहीं समझ पायी कि उस मुसलमान रमणी की जटिल उदर व्याधि मेरे पेट में संक्रामित हो गयी है। पूर्व में भी कभी-कभी वह मुझसे अपने उदर वेदना हेतु औषधि माँगती तथा कुछ दिनों तक अस्वस्थ रहती। उस गरीब नित्य मजदूरी द्वारा जीविकोपार्जन करती अबला को तीन छोटे-छोटे लड़के एवं लड़कियाँ थी। मैं मन ही मन उसकी हालत पर तरस खाती। किन्तु उसकी यह जटिल व्याधि भी कभी मुझमें संक्रामित हो जाएगी, इसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। पूजा के समय कुण्डलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर रखना पड़ता है, उस अवस्था में किसी के द्वारा शरीर को स्पर्श करने पर साधक का दुर्भोग अवश्यंभावी है। मेरे पक्ष में भी वही हुआ। उस समय रोग को भोगने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। कुछ ही दिनों में मैंने बिस्तर पकड़ लिया। शरीर की दुर्बलता एवं उदर वेदना के साथ-साथ रक्ताभाव। दिनभर सोयी रहती एवं सद्गुरु को स्मरण करती। चिकित्सक द्वारा जब कोई विशेष लाभ नहीं हुआ तब गुरु-परमगुरु के भरोसे के अतिरिक्त और क्या उपाय! इसी अवस्था में एकबार रात्रिकाल में एक अत्याश्चर्यजनक घटना घटी। – मैं जपकाल में निमीलित नेत्रों में अवस्थित थी, इसी समय हठात् गुरुगंभीर हुम्–म्-म् निनाद श्रुतिगोचर हुआ। क्रमशः वह ध्वनि तेज होने लगी एवं मुझे आभास हुआ कि मानों भूकंप आ गया हो। उसी मुहूर्त्त पता नहीं किसने मेरे अंतर्चक्षु उन्मीलित कर दिये एवं मैंने दर्शन किया – मेरे मस्तक की तरफ दीवाल पर एक काला

गोलाकार क्षुद्र बिन्दु, मानों क्रमशः वर्धित होते-होते एक विशाल गहरी गुफा में परिणत हो गया। उस गुफा के अभ्यंतर से हुम्-म्-म् शब्द की ओंकार ध्वनि जैसे-जैसे जोरदार होने लगी वैसे-वैसे मैंने पाया कि गुहा के भीतर से एक वृहदाकृति सम्पन्न मनुष्य मेरे घर की तरफ आ रहें हैं। क्षणमात्र में वे मानव गुहा से निर्गत होकर मेरे कक्ष में मेरे आसन के समीप आकर बैठ गये। सर्वप्रथम उन्होंने मुझे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया एवं बाद में मुझसे कहा, ''मैं बहुत दूर से तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा समय बहुत कम है। तुम्हें जगत् हितार्थ कुछ दिन यहाँ अवस्थान करना होगा। कुछ समय पश्चात् शीघ्र ही मैं वृंदावन में इस कलेवर का त्याग करूँगा; अभी मैं सरयु तट पर रहूँगा। सोच-विचार कर मनुष्यों के भोग ग्रहण करने पड़ते हैं। ऐसा फिर मत करना।'' तत्पश्चात् उन्होंने मेरे कर्ण में राममन्त्र प्रदान किया। मन्त्र की ध्वनि से मेरे शरीर में पराचैतन्य स्पंदन स्पंदित हो उठा। मैं मुग्ध नेत्रों से स्तंभित हो गयी। तत्पश्चात् मेरी सात बार परिक्रमा कर पुनः गुहा के भीतर की तरफ ओंकार-ध्वनि करते-करते चले गये। ओंकार से 'राम' शब्द निर्गत होकर समग्र वायुमंडल में बिखर रहे थे।

इसके बाद सारी रात मैंने किस प्रकार अतिवाहित की, इसका कुछ भी स्मरण नहीं है। प्रातःकाल में निद्रा भंग होते ही उस महामानव की आकृति मेरे मानस-नेत्र में उद्भासित हो उठी एवं न जाने कौन मेरे अंतर से बोल उठा, ''ब्रह्मवेत्ता देवराहा बाबा का आगमन हुआ था, तुम उनकी कृपा से पूर्णरूपेण स्वस्थ हो जाओगी।'' वास्तव में उसी दिन से विस्मयकारी रूप से मैंने आरोग्य लाभ किया एवं पहले की तरह उचित आहार ग्रहण कर, दो-तीन दिनों में ही मैं स्वस्थ हो गयी।

तदुपरांत एकदा बाबाजी महाशय (श्रीसरोज लाहिड़ी बाबा को मैं उसी नाम से संबोधित करती थी) के आने पर उनसे मैंने इस घटना का वर्णन किया। सारी बातें सुनकर उन्होंने कहा, ''तुम्हारे साथ देवराहा बाबा का एक गभीर संबंध है यह तुम परवर्त्तीकाल में जान पाओगी।'' उस दिन सारी रात मेरे मन में एक ही चिन्ता व्याप्त रही कि मेरे साथ उनका क्या गभीर संबंध है। यद्यपि इस जीवन में मैंने कभी भी उनका स्मरण नहीं किया तथापि वे मेरे सम्मुख आविर्भूत हुए क्यों!

तत्पश्चात् कुछ ही दिनों के पश्चात् देवराहा बाबा के दर्शन हेतु मैं सपरिवार वाराणसी गयी। सुना था कि उस समय देवराहा बाबा रामगढ़ में गंगातट पर मचान (बाँस के तहर से निर्मित, बाँस के खंभो पर टिका आसन) पर विद्यमान थे। परन्तु दुर्भाग्यवश उस यात्रा में उनसे मेरा साक्षात् नहीं हो पाया। उस दिन अजस्र वृष्टि होती रही, परिणामतः हममें से कोई होटल से बाहर नहीं निकला। रात्रि में निद्रितावस्था में मैंने स्वप्न की तरह देखा - देवराहा बाबा कह रहे हैं –''तुम्हारे साथ मेरा साक्षात् नहीं होगा। मैं सरयु तट पर आ गया हूँ। छः महीने बाद वृंदावन में मैं इस कलेवर का त्याग करूँगा।'' स्वप्न में उनका दर्शन करते समय मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि उनके साथ मेरा क्या गभीर संबंध है? इतने में मेरा स्वप्न भंग हो गया।

इसके कुछ दिनों उपरांत मैं पर्णश्री-निवास पर आयी। तब एकदिन दोपहर में जब मैं ध्यान साधना कर रही थी ठीक उसी समय कूटस्थ के गगन-मंडल को उद्भासित करते हुए ओंकार ध्वनि ध्वनित होने लगी एवं मैंने लक्ष्य किया कि उसी गगनालोक में से एक अति प्राचीन ऋषिवर आविर्भूत हुए। गगनालोक में उनकी काया का ऊर्ध्व अंश ही परिलक्षित हो रहा था। उनको देखते ही मेरे मन में यह प्रश्न उठा, ''आप कौन है?'' उन्होंने संस्कृत भाषा में उत्तर दिया, ''ब्रह्मा पुत्र सनक''। तत्पश्चात् उन ऋषि सनक की आकृति ज्योतिर्मय होकर ज्योति में परणित हो गयी। एवं प्रतिरूप में उसी ज्योति से देवराहा बाबा, एवं बाद में कैवल्यनाथ श्रीश्रीरामठाकुर महाशय की आकृति उभरकर पुनः सनक ऋषि में रूपान्तरित हो गयी। वे मानस तरंगों द्वारा बोले, ''मैं सर्वदा ही तुम्हारे साथ रहता हूँ एवं रहूँगा। निर्भय रहो, जगत् हेतु तुम्हारे बहुत कार्य है।'' ओंकार ध्वनि क्रमशः दूर जाने लगी। और कूटस्थ के मध्य मानों एक निस्तब्ध प्रशान्ति विराजने लगी। संबोधि में मैंने ज्ञात किया कि वह ध्रुव-सत्य –''भगवत स्वरूप के पथ पर ब्रह्मर्षि सनक श्रीश्रीरामलीला में भगवान 'राम' की भूमिका में भगवान श्रीहरि नारायण की पूर्ण द्वादश कला समुद्भूत पूर्णावेश अवतार वरिष्ठ रूप में इस धरणी पर अवतीर्ण हुए सनातन धर्म एवं सत्य प्रतिष्ठार्थ।'' – यह तथ्य उद्भासित होने के पश्चात् मैंने उपलब्धि की -'मेरे साथ उनके गभीर संपर्क का आध्यात्मिक तात्पर्य।' कृपासिंधु श्रीबंधु अवतार कल्प ब्रह्मवेत्ता से ब्रह्मसत्ता में रूपान्तरित हुए थे श्री रामलीला के अंशग्रहण के पश्चात्। उनके संबंध में अवगत होकर मन-प्राण से स्वयं को धन्य माना और बारंबार उनके प्रति प्रणाम निवेदन किया।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

– श्रीराम जय राम जय जय राम –

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न २९ : प्रकृति क्या है? पुरुष और प्रकृति तत्त्व क्या है?

उत्तर : सत्व, रजः और तमः इन तीन गुणों की साम्य अवस्था ही हुई प्रकृति। इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणमयी कहा जाता है। कालसंघात से 'हुँ' कार शब्द करते हुए प्रकृति द्विधा में विभक्त होती है। एक से द्वि-अंशों की उत्पत्ति हुई है इसीलिए परस्पर मिलन की इच्छा स्वभावगत धर्म है। परस्पर स्वाभाविक भाव से द्विअंशों का मिलन जब सम्भव नहीं हुआ तो प्रकृति पुरुष के विपरीत भाव से मिलने के लिए तत्पर हुई। इस मिलन या संयोग से ही आकाश की सृष्टि हुई। इसी पुरुष और प्रकृति के विपरीत भाव से मिलन को शास्त्र में 'विपरीत रतातुरा' कहा जाता है। पुरुष और प्रकृति का विपरीत मिलन ही 'तारा' भाव। इसी भाव से ही 'तारा' मूर्ति के आविर्भाव की सूचना मिलती है। महानिर्वाणतंत्र में वर्णित है –

'' सत्यलोके निराकारा महाज्योतिः स्वरूपिणी।
मायाच्छादितात्मनी चणकाकार रूपिणी।।
माया-वल्कलं संत्यज्य द्विधा भिन्ना यदोन्मुखी।
शिवशक्ति विभागेण जायते सृष्टि कल्पना।।"

–अर्थात्, 'सत्यलोक में आकार रहित महाज्योतिः स्वरूप परमब्रह्म महाज्योतिस्वरूपा अपनी ही माया द्वारा स्वयं आवृत होकर चणक के सदृश विराजित है। चणक जब अपने खोल के मध्य अंकुर सह दो डालियों के दानों के सदृश एकत्र रूप से आबद्ध रहते है, पुरुष और प्रकृति भी उसी प्रकार ब्रह्मचैतन्य सह मायारूप वल्कल भेद कर शिवशक्ति रूप से प्रकट हुए है।' प्रकृति पुरुषात्मक जीवदेह ब्रह्मचैतन्य द्वारा सचेतन हुई है। इसीलिए यहाँ पर 'ब्रह्म चैतन्य सह' कहा गया है। ब्रह्म चैतन्य के परित्यक्त होने से जीवदेह जड़ में परिणत हो जाती है। निर्गुण और निष्क्रिय होने से ही ब्रह्म और सगुण या प्रकाश होने से ईश्वर अथवा पुरुष कहा जाता है। प्रकट या सगुण होने की इच्छाशक्ति ही प्रकृति अथवा आद्याशक्ति महामाया। ब्रह्म की इच्छाशक्ति ही कालिका देवी; इसीलिए 'माँ' आद्याशक्ति महामाया नाम से अभिहिता है। 'योगमाया' ब्रह्म की अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति हुई 'महामाया'। एक ही आद्याशक्ति पंचतन्मात्रा और पंचभूत में विराज करती है, अतिसूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम भाव में आत्म-गोपन रूप से। स्थूल और सूक्ष्म में शक्ति का विकास पाँच प्रकार से होता है - परा, अपरा, योगमाया, महामाया और कुण्डलिनी; पराशक्ति निर्गुणा एवं अपरा शक्ति भोगात्मिका। कुलकुण्डलिनी एवं कुण्डलिनी जीवनी शक्ति या प्रकृति।

सगुण और निर्गुण का संयुक्त भाव ही ब्रह्म है। सगुण महाशक्ति अथवा माँ एवं निर्गुण शिव या बाबा। शिव लीलामय, गौरी या शक्ति लीलामयी – यही हुआ पुरुष और प्रकृति समष्टि एवं व्यष्टिगत तत्त्व रहस्य।

प्रश्न ३०: प्रयागतीर्थ में त्रिवेणी स्नान का रहस्य क्या है?

उत्तर : शास्त्रों में वर्णित् है, 'अन्तः स्नान विहीनस्य बहिः स्नानेन किं फलम् ?'– अर्थात्, अन्तः स्नान के बिना बाह्यिक स्नान का कोई फल नहीं है। जो आत्मतीर्थ के ज्ञाता होते है आज्ञाचक्र के ऊर्ध्व में इस तीर्थराज त्रिवेणी में मानस स्नान करते है, वे मुक्तिपद प्राप्त करते है। मध्यभारत में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को प्रयाग में स्नान-संबंध से अवगत करवाया –

'आत्मा नदी संयम पुण्यतीर्था सत्येदका।
शीलतटा दयोस्मिः तत्राभिषेकं कुरु पाण्डु पुत्र!
न वारिणा शुद्धति चान्तरात्मा।।'

–अर्थात् 'हे पाण्डुपुत्र अर्जुन! इन्द्रिय संयम है जिसका पवित्र घट, सत्यव्यवहार है पवित्र जल के सदृश, सरल स्वभाव है पहाड़ एवं दया जिस नदी की तरंग है, तुम उसी ज्ञान नदी में स्नान करो, बाह्य जल से मन पवित्र नहीं हो सकता।'

भक्तवृन्द स्नात होते है पवित्र बाह्यिक नीर में पौराणिक तत्त्व के पुण्यप्रताप से भक्त की तमोरूपी जितनी कालिमा है वे सभी यमुना में धौत होती है, रजो धौत होती है गंगा में एवं सत्त्व वर्द्धित होता है सरस्वती के पवित्र स्पर्श से। श्रवणेन्द्रियों में श्रीकृष्ण की मधुर वंशीध्वनि जो 'राधा-राधा' के नाम का ज्वार लाती है यमुना के तट पर काले जल में। मन में उदय होता है परम वैराग्य भाव और गैरिक वसन धारिणी पतित पावनी के शुभ्रस्वच्छ स्रोत में मन लीन हो जाता है अनन्त की ओर। परम गुरु भक्त सम्राट अशोक तुम्हारी अमरकीर्ति चिह्नस्वरूप ध्वंसावशेष दुर्ग, शत-शत विपद अतिक्रम करने

का साक्षी होकर आज भी खड़ा है अपना मस्तक ऊँचा करके! और आह्वान करते हुए जैसे कह रहा है –'धर्म की जय अधर्म का क्षय इस यमुना के तट पर।'

साधकों को परमगति की प्राप्ति होती इसी संगम में। मन का संयम ही संगम या एकत्व प्राप्ति, आदि तत्त्व में गमन, प्रकृति का विलय। अत्यंत तीव्र वेग से गंगादेवी का लाल जल यमुना के प्रशान्त वक्ष पर गिर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे विरह से व्याकुल श्रीराधिका श्रीकृष्ण के वक्ष पर बेचैनी से अनुधावित हो रही है मिलनानन्द हेतु। उनके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं है; पुराणों शास्त्रों में कहा गया है, यहाँ स्नान करने से जीव को मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही विश्वास और आस्तिकता जब बोध के अन्तर में सत्य प्रतिष्ठित होता तब जीव निश्चय ही मुक्ति पाता है बाह्यिक स्नान से। कितने भक्त, कितने साधक, ऋषि–मुनि स्नान करते है इस तीर्थराज प्रयाग में।

प्रश्न ३१: दीक्षा शब्द का तात्पर्य क्या है?

उत्तर : विश्वसार तंत्र से उद्धृत है–

'दिव्यज्ञानं यतोददात् कूर्यात् पापक्षयं ततः।
तस्मादीक्षेति सा प्रोक्ता सर्व तन्त्रसा सम्मता।'

–अर्थात्, 'जो दिव्यज्ञान प्रदान करते है एवं पाप नष्ट करते है उसे ब्रह्मतंत्रविद्गण दीक्षा बोलकर कीर्तन करते है।'

और वेदान्त में कहा गया है, 'आचार्य चैतन्यवपुषा सगतिं व्यनक्ति।' – अर्थात् आचार्य रूप से या सद्गुरु रूप से भगवान अपनी गति प्रकाशित करते है। सर्वान्तर्यामी भगवान आचार्य के चित्त में अवस्थान कर तत्त्वज्ञान प्रकाश कर शिष्य की मुक्ति का विधान करते है।

'दीक्षा' शब्द का अन्य अर्थ ईक्षण अथवा दर्शन दान करना; इस संदर्भ में दर्शन अर्थ से ब्रह्म चैतन्य का सगुण प्रकाश या ज्योति–दर्शन के विषय में ही कहा गया है, जिस ज्योति–दर्शन के फलस्वरूप साधक के कूटस्थ रूपी विश्वयोनि में विश्व का रूप प्रकटित होता है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कृष्ण कथा

राजा सत्राजित्कन्या देवी सत्यभामा

पुराकाल में देवशर्मा नाम के एक तप:प्रदीप्त वेदज्ञ महर्षि थे। वे प्रकृत ब्राह्मण थे। उनकी स्त्री का नाम रुचि था। देवराज इन्द्र के इस रूपवती रुचि के प्रति अभिलाषी होने पर देवशर्मा–शिष्य विपुल ने उनके मार्ग में रूकावट डाली तथा देवशर्मा ने इन्द्र को अभिशाप प्रदान किया। उस अभिशाप के फलस्वरूप ही परवर्तीकाल में इन्द्र कृष्णहस्त से पराजित हुए। इन्हीं मुनिसत्तम देवशर्मा की 'गुणवती' नाम की एक कन्या थी। देवशर्मा ने अपने शिष्य चन्द्र के साथ गुणवती का पाणिग्रहण करवाया। एक समय देवशर्मा और चन्द्र ने जब वन में कुश और सूखी लकड़ियाँ आहरणार्थ गमन किया तो वहीं पर दोनों राक्षस के हस्त से निहत हुए। गुणवती ने एकादशी और कार्तिक पुण्यक व्रत पालन कर यथासमय में प्राणत्याग कर अगले जन्म में 'सत्यभामा' के रूप में जन्मग्रहण कर श्रीकृष्ण की धर्म पत्नी हुई। 'सत्यभामा' नाम का तात्पर्य हुआ कि, जो भामिनी ने सत्य को अवलम्बन किया था। सत्य को अवलम्बन करने पर सत्यस्वरूप की प्राप्ति होती है। यही हैं उस सत्य अवलम्बनकारी नारी का साक्षात् रूप। सत्यभामा ने परमसत्य स्वरूप व्रत अवलम्बन कर भगवान को पति रूप में प्राप्त किया था।

एकबार नारद ने श्रीकृष्ण से साक्षात् करने के लिए स्वर्ग से प्रस्थान करते समय कल्पवृक्ष के कुछेक पुष्प साथ लेकर आगमन किया। श्रीकृष्ण से साक्षात् के समय उन्होंने वे पुष्प श्रीकृष्ण को सश्रद्धा प्रदान किए। श्रीकृष्ण ने उन फूलों को स्वीकार कर उन्हें महिषीगणों के मध्य वितरित कर दिया। किन्तु भ्रमवशत: उन्होंने सत्यभामा को कुछ भी प्रदान नहीं किया। इससे सत्यभामा के मन में अत्यंत अभिमान हुआ। तदनंतर अपनी भूल समझ कर श्रीकृष्ण ने सत्यभामा के अभिमान के नाश हेतु गरूड़ पर आरोहण कर देवपुर की ओर प्रस्थान किया एवं वहाँ से कल्पवृक्ष को बलपूर्वक द्वारका में लाकर सत्यभामा के गृह–प्रांगण में रोपण किया। सत्यभामा यह कल्पवृक्ष प्राप्त कर परम सन्तुष्ट हुई एवं किस प्रकार से प्रतिजन्म में श्रीकृष्ण के सदृश पति एवं कल्पवृक्ष प्राप्त किया जा सकेगा उस विषय में नारद से जिज्ञासा किया। नारद ने तब परामर्श दिया कि तुलापुरुष दान करने से वह संभव हो सकेगा। सत्यभामा ने यह

सुनकर श्रीकृष्ण को यथाविधि कल्पवृक्ष सह तोलनकर नारद को प्रदान किया एवं तत्पश्चात् उनका आसन्न विच्छेद स्मरण कर मनप्राण से विह्वल होकर गिर पड़ी। तब श्रीकृष्ण के नामांकित तुलसीपत्र के विनिमय में नारददेव से उन्होंने पुनः स्वामी को पा लिया। नारद ने भी तब कल्पवृक्ष लेकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। तब एकदिन सत्यभामा ने श्रीकृष्ण से जिज्ञासा किया कि किस कारण से उन्होंने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें अपने पूर्वजन्म का वृत्तान्त कीर्तन किया।

सत्यभामा राजा सत्राजित् की कन्या थी। सत्राजित् शिनि के ज्येष्ठ भ्राता निघ्न के पुत्र और एक यदुवंशीय राजा थे। सत्राजित् सूर्य के उपासक थे एवं सूर्य से अतिशय प्रीति होने के कारण सूर्य देव ने प्रणय चिह्नस्वरूप स्यमन्तक-मणि सत्राजित् को प्रदान की। उस अत्युत्कृष्ट मणि से सुवर्ण उत्पन्न होता था एवं उसके प्रभाव से अनावृष्टि नहीं होती तथा सम्पूर्ण देश में व्याधि का भय भी नहीं था। सत्राजित् पूर्वजन्म में अत्रिवंशीय एक प्रकृत ब्राह्मण थे। तब उनका नाम था देवशर्मा।

राजा सत्राजित् ने अपने कनिष्ठ भ्राता प्रसेनजित् को यह अमूल्य मणि दान में दी। सत्राजित् के सदृश प्रसेनजित् पुण्यवान नहीं थे इसीलिए यह मणि धारण कर मृगया के लिए जाने पर वे सिंह द्वारा निहत हुए। पश्चात् में जाम्बवान ने उस सिंह की हत्या कर इस मणि को संग्रह किया और अपने पुत्र को प्रदान किया। सत्राजित् ने जब प्रसेनजित् को नहीं देखा तो विचार किया कि प्रतीत होता है श्रीकृष्ण ने ही मणि के लोभ में प्रसेनजित् की हत्या की है। श्रीकृष्ण ने जब यह सुना तो वन में गमन कर निहत प्रसेनजित् और सिंह को देखा; लेकिन उन्हें मणि नहीं मिली। पदचिह्नों का अनुसरण करते हुए श्रीकृष्ण ने युद्ध में जाम्बवान को पराजित कर मणि का उद्धार किया एवं सत्राजित् को मणि पुनः लौटायी। इस प्रकार वृथा दोषारोपण से लज्जित होकर सत्राजित् ने मणि और अपनी कन्या सत्यभामा को श्रीकृष्ण के हाथों में अर्पण किया। श्रीकृष्ण और सत्यभामा का पाणिग्रहण सम्पन्न हुआ तथा सत्राजित् को पुनः मणि मिल गयी। अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा (यादवराज) सत्यभामा के पाणिप्रार्थी थे। भोजवंशीय योद्धा अक्रूर और कृतवर्मा का मनोरथ विफल हो जाने पर उन्होंने मणि ग्रहण करने के लिए सत्राजित् की हत्या हेतु शतधन्वा को उत्तेजित किया। परिणामतः सत्राजित् निद्रित अवस्था में शतधन्वा द्वारा निहत हुए। और शतधन्वा ने मणि हस्तगत कर ली। स्यमन्तक-मणि के लिए श्रीकृष्ण ने शतधन्वा को उत्पीड़ित किया तब उसने गोपनीय रूप से मणि अक्रूर को देकर वहाँ से पलायन किया। अक्रूर श्रीकृष्ण के पितृव्य थे। श्रीकृष्ण ने शतधन्वा का वध करने का निश्चय किया। शतधन्वा जब इस संवाद से अवगत हुए तो उन्होंने अक्रूर और कृतवर्मा से सहायता की याचना की लेकिन उन्होंने श्रीकृष्ण के विरूद्ध शतधन्वा की सहायता करने से मना कर दिया। दूसरी ओर नववधु सत्यभामा पिता की मृतदेह को तेल में संरक्षित कर, स्वामी के निकट उपस्थित हुई। तब कृष्ण और बलराम द्वारा शतधन्वा का वध करने पर सत्यभामा तुष्ट हुई।

यदुवंश के ध्वंस और श्रीकृष्ण के महाप्रयाण के पश्चात् अन्यान्य यादव रमणीगण के साथ इन्द्रप्रस्थ में नीत हुए। तदनन्तर इन्होंने हिमालय अतिक्रम कर कलाप ग्राम में जीवन का अवशिष्ट काल श्रीकृष्ण के ध्यान में अतिवाहित कर समाधि प्राप्त की। सत्यभामा के गर्भ से श्रीकृष्ण के 'भानु' प्रभृति सप्त, मतान्तर में दस पुत्रों और चार कन्याओं का जन्म हुआ। गर्ग संहिता के मत से सत्यभामा के दस पुत्रों के नाम यथाक्रम से – भानु, सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान, चन्द्रभानु, वृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु, ये दस तनय प्रद्युम्न के सहित दिग्विजय करने निकले थे। मानु, भौमरिका, ताम्रपर्णी और जरन्धमा ये चार कन्याएँ थी।

गर्ग संहिता के गोलोक खण्ड में वर्णित है, गोलोक बिहारी हरि श्रीकृष्ण रूप में जब धरा पर अवतीर्ण हुए तब देवी वसुधा ने सत्यभामा रूप में जन्मग्रहण किया। अद्भूत रामायण में है, श्रीकृष्ण महिषी सत्यभामा संगीत शास्त्र में निपुण थी। देवर्षि नारद ने उनसे संगीत शिक्षा अर्जित की। कल्कि पुराण के मत से, श्रीकृष्ण के कल्कि अवतार रूप में धरा में अवतीर्ण होने के पश्चात् सत्यभामा भी परम वैष्णव शशिध्वज नृपति की कन्यारूप में अवतीर्ण हुई थी एवं तब उनका नाम था 'रमा'।

(*सहायक ग्रन्थादि : स्कन्द पुराण, विष्णु खण्ड; पद्मपुराण, उत्तर खण्ड; हरिवंश, गर्गसंहिता और कल्किपुराण*)

संकलन – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्द्योपाध्याय

(१०)

स्थावरं जंगमं व्याप्तं यत्किन्चित् सचराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।।३६

अस्मिन् स्थावरजंगमात्मके जगति यत्किन्चित् सचराचरमस्ति, तत् सर्व्वं यत्पदेन व्याप्तं (एवम्भूतं) तत् पदं येन दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः।।३६

इस स्थावर जंगमात्मक जगत् में जो कुछ गतिशील अथवा स्थितिभाव में अवस्थान कर रहे हैं, ये समस्त उसी गुरुपद का अवलम्बन कर अवस्थित है, वह पद जिन्होंने दृष्टिगोचर करवाया है उन्हें नमस्कार।।३६

कहने का तात्पर्य यह है कि, जीव अन्तर में कूटस्थ के ध्यान में रहते-रहते क्रमशः बाह्यदृष्टि द्वारा सर्वत्र कूटस्थ का प्रकाश देख पाता है; क्या घट, क्या पट और जीवमूर्तियों के सर्वघटों में वह देखता है कि कूटस्थ मध्य सर्ववस्तु का आविर्भाव होता है (गीता अः ११, श्लोक १५ देखें) इसी कारण कूटस्थ का साधन बाह्य-विषय के साथ भी होता रहता है, इसीलिए घट या मूर्ति स्थापन द्वारा पूजा की व्यवस्था है। परन्तु वह पूजा बाह्यभाव से घट की मृत्तिका के रूप, अथवा मूर्ति के बाह्य देह की पूजा नहीं है, वह कूटस्थ की ही पूजा है एवं कूटस्थ समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण है अतएव साधक उत्पत्ति के कारण पर लक्ष्य रखकर बाह्यप्रकाशित जड़वस्तुओं के रूप अनासक्त भाव से देखता है, तदनन्तर जब लय उत्पत्ति विषय सूक्ष्म में होते है, तब वह जड़मूर्ति का अनित्यत्व देखता है एवं समझता है कि कूटस्थ ही सत्य है, यह धारणा उसे प्रत्यक्ष भाव से होती है – यही पूजा का फल है; नचेत् मृत्तिका की पूजा अथवा गठित मूर्ति की जड़देह में गुणारोप कर काल्पनिक पूजा से ब्रह्मभाव की उपलब्धि नहीं होती।

–वह अधमाधम पूजा कहकर मानी जाती है।

चिन्मयं व्यापितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम्।
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।।३७

(सर्व्वं) चिन्मयं ब्रह्म (यतः) सर्व्वं सचराचरं त्रैलोक्यं (तेन्यैव) व्यापितं, तत्पदं येन दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३७

वे ही सूक्ष्माणु चित्स्वरूप (अर्थात् ज्ञानस्वरूप) ब्रह्म हुए हैं, इस चराचरयुक्त तीनों लोकों को व्याप्त करके वे हैं; उनके ही पदस्वरूप (अर्थात् स्थिति स्थान स्वरूप) के अनुग्रह से दर्शन प्राप्त किया, उन्हीं श्रीगुरु को नमस्कार।।३७

ब्रह्मपद में चित्स्वरूप ब्रह्म अवस्थित है इसीलिए पद का माहात्म्य समझा जाता है। जिस प्रकार देह का माहात्म्य देहधारी पुरुष के गुणानुसार निर्णीत होता है, एवं शरीर में उसी-उसी गुणों का विकास होता है; अतः देह पूजा या घृणा ही विवेचित होती है, अर्थात् देहाभ्यंतरस्थ जीव के देहोपरि गुणों का आभास प्रकटित होता है इसीलिए उनकी देह पूज्य या घृणा विवेचित होती है, तद्रूपभाव से 'चित्' का आभास कूटस्थपद के प्रति प्रतिफलित होने से, वह पद ही ज्ञान विकासक होता है – सांख्य सूत्र अः १म, श्लोक १३२ देखें, 'जड़ प्रकाशयोगात् प्रकाशः' एवं द्वितीय अध्याय श्लोक ३४ देखें 'कुसुमवच्चमनिः' इसी प्रकार मन्त्रद गुरु के देह में अन्तरस्थित ब्रह्म का आभास प्रतिफलित होता है इसीलिए गुरु भी तदीय देह में बाह्य जगत् में पूजनीय होता है।

सर्व्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजम्।
वेदान्ताम्बुज-सूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः ।।३८।।

तत् पदाम्बुजं सर्व्वासाम् श्रुतानाम् शिरोपरि रत्नवत् विराजितं; वेदान्तरूपस्य अम्बुजस्य सूर्याय (प्रकाशकाय इत्यर्थः) तस्मै श्रीगुरवे नमः।।३८।।

सर्व्वप्रकार श्रुति की (ओंकार ध्वनि जो श्रुतिगोचर होती है) शिरो-रत्नरूप से जिसकी अवस्थिति है, अर्थात् उस पदकमल में जाकर स्थिति सम्पन्न होने पर सर्वप्रकार की श्रुति अन्तर्धान होकर जीव स्थिति सम्पन्न होता है। उस पद के अधिष्ठातृ देवता हुए सूर्यस्वरूप कूटस्थ ब्रह्म, प्रकृत ज्ञान प्रकाशक कहकर उन्हें वेदान्त के अर्थात् विज्ञान के सूर्य-स्वरूप कहा जाता है, वे वेदान्त के अर्थात् शिवस्वरूप अक्षरब्रह्म के प्रकाशक रूप में स्थित है, अर्थात् उनमें स्थिति सम्पन्न होने से ही विज्ञान की अवस्था प्राप्त कर जीव की अक्षरपद में गति होती है। ऐसे गुरु को नमस्कार।।३८।।

...क्रमशः

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमा सर्वाणी

परमब्रह्म के साक्षी

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

गतांक से आगे–– **(३१)**

दर्शन के विवरण के माध्यम से इस प्रकार कहा जाता है – सम्मुख में स्वच्छ (crystal clear) शुभ्र ज्योतिर्मय जालीदार पर्दा; यह मायिक जाल है, मायिक जगत् के मध्य मेरी सत्ता दण्डायमान है और उस जाल के पीछे एक विराट् सूर्यसम परम-ज्योति का प्रकाश दिखाई देता है; क्रमशः उस परम-ज्योति की ओर चेतना एकाग्र हुई एवं मायिक जाल का कुछ अंश उन्मुक्त हो गया। उस उन्मुक्त पथ से होती हुई परमज्योति की छटा सत्ता के मध्य आकर मिलने लगी। प्रणव की गंभीर ध्वनि उसी परमज्योति से निकलकर दिगन्त विस्तृत निनाद के रूप में प्रतिध्वनित हो रही थी। इस बार यह गौर किया कि वह परमज्योति छटा मायिक जाल के समग्रस्थान को जोड़ती हुई अणु आकार में ज्योतिर्बिन्दु रूप में स्वर्णप्रभायुक्त अवस्था में जाल का भेदन कर अविरत सत्ता के वक्ष पर आकर मिश्रित होकर अग्रसर होने लगी। अनेक क्षणों तक अवाक् विस्मय निश्चल होकर इस दृश्य का अवलोकन करने के पश्चात् सत्ता के मध्य ज्ञान प्रतिभात हुआ कि इसी को ही मायामुक्तावस्था कहा जाता है; मायिक जगत् का आवरण उन्मुक्त हो जाने पर सत्ता प्रवृत्ति को निवृत्त कर निवृत्ति मार्ग में स्थिति लाभ करने पर स्थूल देह वर्तमान स्थित अवस्था में और इसी तरह जीवनमुक्त अवस्था में साधक-योगी उपनीत हो सकता है, यह असंभव नहीं है।

प्राण स्थिर होने पर इन्द्रियाँ निष्क्रिय हो जाती है। समस्त इन्द्रियाँ संकुचित होकर बिन्दु स्थान में आकर विलीन हो जाती है – लययोग; जिसके फलस्वरूप तब विचित्र जगत् शून्याकार धारण करता है एवं सत्ता का बोध विलुप्त हो जाता है; इस अवस्था में उपलब्धि किया कि अहम्बोध एक सूक्ष्मातिसूक्ष्म तेजोमय सत्ता को आश्रय कर प्रकाशित होता है; बाद में सुदीर्घकाल तक अभ्यास के फलस्वरूप इस तेजोमय सत्ता की चंचलता का आभास लुप्त होकर ज्योति में परिणत हो जाता है। अभ्यास में परिपक्वता आने पर द्रष्टा और ज्योतिर्मयसत्ता क्रमशः निकटस्थ होकर तादात्म्य लाभ करती है; तब मात्र स्पन्दन ही आत्मबोध के निदर्शन रूप में वर्तमान रहता है। यही है महाज्ञान रूपी संबोधि। परवर्ती अवस्था में सहस्रार स्थित मूला केन्द्र से योगी के सत्ता मध्य परासम्वित का अवतरण होता है जिस के फलस्वरूप ऊर्ध्वशक्ति की धारा और अधःशक्ति की धाराओं में एक अवतरण करती है एवं दूसरी उत्तोलित होती है तथा दोनों शक्तियों की धाराएं हृदय केन्द्र पर आकर एक ही बिन्दु पर मिलती है। इसी तरह योगी नित्यसिद्ध अवस्था प्राप्त करते है। *...क्रमशः*

हिन्दी अनुवाद – माचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

भ्रमण

हेमकुण्ड की ओर

(३)

वर्ष २०१२ के प्रकृति के रुद्ररूप के चिह्नों के छाप के प्रत्यक्ष प्रमाण आज भी उत्तराखण्ड के एक बड़े अंश पर देखने को मिलते है। श्रीश्रीमाँ के स्नेह विधुर कठोर अनुशासन की बेड़ियों से मेरे पैर पकड़े हुए थे, 'इस समय किसी प्रकार से भी उत्तराखण्ड के गढ़वाल हिमालय में जाने की अनुमति नहीं है' – माँ का स्नेहयुक्त कठोर निर्देश, लेकिन मैं हिमालय के अमोघ आकर्षण की उपेक्षा कैसे करता? गढ़वाल हिमालय मुझे हाथ के इशारे से जैसे बार-बार बुला रहा हो। पुनः श्रीश्रीमाँ के चरणों में आवेदन निवेदन शुरू हुआ। अनुमति माँग रहा था फूलों के उस समारोह (घाटी) में प्रवेश करने की। कभी-कभी माँ के समक्ष स्पष्ट आवेदन, तो कभी क्रिया द्वारा निःशब्द निवेदन, फिर कभी जाने के आशय से भरी हुई आँखें लेकर माँ के सामने घंटों ही बैठे रहना। अवशेष में बर्फ को गलना ही था। आवश्यक कार्य के लिए श्रीश्रीमाँ ने मुझे उस अंचल में जाने की अनुमति दे ही दी। मेरी प्रसन्नता की सीमा न रही। खूब जोर-शोर से मैंने जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी। २१ जुलाई २०१५ को मेरे जाने का दिन निश्चित्

हुआ। देखते-देखते ही जाने का दिन करीब आ गया। १७ जुलाई अकस्मात् ही शिवदादा (स्वामी शिवानन्द) ने फोन द्वारा सूचित किया कि –'नेपाल में आने वाले भूकम्प ने उत्तराखण्ड को भी छुआ हैं। अत: रुद्रप्रयाग के नज़दीक मार्ग अवरोधित है। अतएव अभी वहाँ जा न सकोगे।' तुरंत ही श्रीश्रीमाँ के पास चला आया। मुझे देखते ही माँ स्नेह से बोल उठी, 'अभी तुम्हारा जाना नहीं होगा। एक महीने के उपरांत जाना।' इस प्रकार मेरे जाने में थोड़ा और विलंब हुआ। श्रीश्रीमाँ का आशीर्वाद लेकर यात्रा शुरू की १६ अगस्त, गन्तव्य Valley of Flowers। लक्ष्य २०१२ के प्राकृतिक दुर्योग के पश्चात् इस अंचल का प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण।

निर्दिष्ट समय से आधे घण्टे पूर्व ही कुम्भ-एक्सप्रेस ने मुझे हरिद्वार पहुँचा दिया। भारत सेवाश्रम संघ में एक रात्रि यापन की। अगले ही दिन यात्रा प्रारंभ की गोविंद घाट की ओर। इस बार हेमकुण्ड, Valley of Flowers में जाने वाले पर्यटकों की संख्या अंगुलियों पर गिनी जा सकती थी। ढलती हुई दोपहर में निर्विघ्न ही गोविन्दघाट पहुँच गए। मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमने प्रकृति की क्रूर ध्वंसलीला के चिह्नों को प्रत्यक्ष देखा रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और श्रीकोट में। साक्षात् किया प्रकृति के रौद्ररूप का जो मनुष्य सृष्ट थी। यंत्र-सभ्यता के आत्मगर्व से गर्वित मनुष्यों ने प्राकृतिक विधि-निषेधों की उपेक्षा कर चारधाम की रक्षाकर्त्री धारादेवी की पहाड़ी को डायनामाईट से उड़ा दिया था। उद्देश्य था अलकानंदा के वक्ष पर डैम बनाना। गढ़वाल हिमालय का परिवर्तनशील पहाड़ डायनामाईट के विस्फोट को सहन नहीं कर सका। सम्पूर्ण क्षेत्र काँप उठा। शुरू हुआ कम्पन। धारादेवी का मन्दिर निमज्जित हुआ अलकानंदा के गर्भ में, शुरू हुई अनवरत वृष्टि। यदि वास्तव में देखा जाए तो इन सब का परिणाम क्या हुआ? अन्तत: मनुष्य का अहंकार ही हुआ चूर्ण। इसके साथ ही सृष्टि के देवता की ध्वंसलीला का कोपभाजन बनना पड़ा उन गढ़वाल निवासियों को। यहाँ आने से पूर्व श्रीश्रीमाँ के श्रीमुख से ही सुना था सृष्टि और ध्वंस के देवता के इस स्वविरोधी रूप के विषय में। यहाँ आकर उस प्रसंग को प्रत्यक्ष किया और भी अच्छी तरह से।

गोविन्दघाट के नवनिर्मित लौह-पुल को पारकर चलते-चलते अग्रसरित हुआ चढ़ाई की ओर। गन्तव्य – घांघरिया। उन दिनों का १३ कि.मी. का मार्ग आज बढ़कर १६ कि.मी. हो गया है। तसवीरों के सदृश ग्राम पुलना आज जनशून्य – सिर्फ ध्वंसावशेष। स्थिर कदमों से चलते-चलते जंगल के निकट आ पहुँचा। उसके उपरांत गन्तव्य स्थल घांघारिया भी पहुँच गया।

अब मेरा प्रथम एवं प्रधान लक्ष्य था Valley of Flowers। आने के पथ में हेमकुंड के रास्ते में ब्रह्मकमल, ब्लुपपि-सह रंगबिरंगे फूलों का जो समारोह दृष्टिगोचर हुआ उससे ही मन जैसे आनन्द से परिपूर्ण हो गया। Valley में आने और जाने का प्रयोजन है कि नहीं सोच रहा था। हठात् जैसे श्रीश्रीमाँ का अमोघ निर्देश मेरे कानों में गुंज उठा- 'जिस पथ से आए हों उस से विच्युत मत होना'। एकदम भोर में घर के दरवाजे पर कराघात होने लगा। दरवाजा खुलने पर देखा झूर्रीयुक्त एक अनाबिल हँसता हुआ मुख। मुस्कुराते हुए वयस्क गढ़वाली मनुष्य ने मुझसे कहा –'चलिए यात्रा प्रारंभ करते है। मार्ग में पड़ेगा भुर्जवृक्ष का जंगल, आपको तो भुर्जपत्र का प्रयोजन है, चलिए स्वयं ही तोड़ लीजिएगा।' मैं हतप्रभ रह गया। मुझे समझने में कुछ समय लगा कि यही तो श्रीश्रीमाँ का निर्देश है। मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु चल पड़ा। आगे-आगे पथ निर्देशक-रूप में वृद्ध पुरुष चल रहे थे, पथ के संगी थे बहुरंगी हिमालय के पक्षी। प्रतीत हो रहा था जैसे वे भी साथ-साथ में चलते हुए स्व भाषा में बातें कर रहे हों। प्राकृतिक दृश्यों को निहारते हुए पुष्पवती नदी के पुल को पारकर हमने भुर्ज वृक्ष के जंगल में प्रवेश किया। अपने शरीर और मन में एक नया जोश महसुस किया। पेड़ पर चड़कर मैंने भुर्जवृक्ष की छाल बटोरी या भुर्जपत्र लिया। लौटकर आने के पश्चात् श्रीश्रीमाँ ने कहा, 'बहुत काम की वस्तु लेकर आए हो'। तत्पश्चात् ही मेरे मुँह से निकला – 'तुम्हारी इच्छा से ही तो आया है।'

घांघारिया से Valley of Flowers का मार्ग साढ़े तीन कि.मी. से विस्तारित होकर पाँच कि.मी. हुआ है। चढ़ाई की दूरी भी पहले से अधिक हुई है। Valley परिधि का विस्तार ६ कि.मी. से बढ़कर १० कि.मी. तक हो गया है। फूलों का विचित्र सौन्दर्य भी वर्द्धित हुआ है। अनेक नयी नयी प्रजातियों के फूलों के मनमोहक रूप ने जैसे स्मृति-पटल पर अपनी नयी पहचान बना ली। भालुओं की संख्या में वृद्धि हुई। हिम-चीता (Snow leopard) के आने-जाने के चिह्न भी दिखाई दिए पुष्पवती नदी के आसपास। नदी के किनारे फूलों के उस जलसे में नित्य नूतन अतिथियों

का आविर्भाव होता है। उन सभी अतिथियों का सान्निध्य पाने के लिए पुनः जुलाई महीने के अंत में यहाँ आना होगा। पश्चिम का आकाश घने काले मेघों से आच्छादित हो गया। देखते ही देखते बादलों ने बरसना भी शुरू कर दिया। वारिस की बौछारों से बचने के लिए जल्दी ही हमने बड़े बड़े पत्थरों का आश्रय लिया। घंटे भर के मध्य ही बादलों से लुकाछिपी करते हुए भगवान सूर्य पुनः स्पष्टतः दृष्टिगोचर होने लगे। हमने भी लौटने का पथ पकड़ा।

–मातृचरणाश्रित श्रीसौरव बासु

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(१४)

शुभ नववर्ष (बांगला -१४१६, दिनांक - १५/४/०९)

श्रीश्रीमाँ के अनमोल वचन–

सत्धर्म मनुष्यों के जीवन में श्री वृद्धि करता है, गृहस्थ के गृह एवं परिवार की श्री वृद्धि करता है अन्यथा अधर्म के पथ पर चलते हुए मनुष्य ध्वंस हो जाते हैं। सन्तान को निज धर्मबोध की सहायता से सत्शिक्षा देना प्रत्येक माता-पिता के लिए उचित एवं आवश्यक है। सत्शिक्षा दान करने के लिए माता-पिता को पहले मानव अर्थात् 'मन का होश' पर उपनीत होना होगा। परन्तु यदि वे सिर्फ माया के वशवर्त्ती होकर सन्तान की अन्तःस्थित प्रवृत्ति को जागतिक प्रवृत्ति मार्ग में ही प्रश्रय देते रहेंगे तो किसी न किसी रूप में एकदिन सन्तान द्वारा माता-पिता को आघात अवश्य ही खाना पड़ेगा। आघात खाकर शान्ति की खोज में सद्गुरु के श्रीचरणों में शरणागत होकर 'मुझे शक्ति दो, मेरा मंगल करो, मेरा दुःख वेदना दूर करो' इत्यादि निवेदन कर हाहाकार करने से क्या फायदा होगा? सद्गुरु भी तब क्या कर सकते हैं? उनके सदुपदेश देने पर भी कितने लोग उसे ग्रहण कर सकते हैं? सद्ग्रन्थ पढ़ने से, महात्माओं का जीवन-आदर्श जानने से, महात्माओं द्वारा रचित सद्भावना प्रेरित पुस्तकादि पढ़ने से मन में सदैव सत्चिन्ता का समावेश होता है एवं उस सत्चिन्ता का प्रभाव परिवार के प्रत्येक सदस्यों पर अवश्य पड़ता है। तब इसी से परिवारस्थ सकल सद्भावना के प्रभाव से उद्बुद्ध अवश्य होंगे। इसीसे 'मन का होश' होता है। साधारण पुस्तकादि, कहानियाँ, उपन्यास इत्यादि में सिर्फ संसारिक जटिलता, नर-नारी का जैविक प्रेम, सुख-दुःखादि की काल्पनिक कथाऐं जिन्हें पढ़कर यदि माँ-बाप अपना समय बिताते हैं, तो उनकी सन्तान क्या होगी? मनुष्यत्व का अपमान होकर, मनुष्य जीवन निरर्थक होकर, मानव चेतना के विवर्तन की धारा में पशुयोनि में जाना पड़ेगा। तुमलोगों में जिन्होंने क्रियादीक्षा ली है, क्या जानते हो कि मनुष्य का अन्तःस्थित जो आलोक है, वह निजसत्ता के अस्तित्वबोध का आलोक - आत्मज्योति है। सद्गुरु दीक्षा के दिन कूटस्थ में उस ज्योति का ही दर्शन करवाकर 'ईक्षण' दान करते हैं। एकमात्र सद्गुरु प्रदत्त कर्म के माध्यम से ही कूटस्थगुहा में रक्षित आलोक अक्षय होकर तुम्हारे मध्य प्रदीप्त हो सकता है। सद्गुरु की कृपा से वह मनदर्पण से कभी निर्वापित नहीं होता। जो नित्य क्रिया नहीं करते, जान लेना, वे अपने मध्य विराजित भगवान की ही उपेक्षा करते हैं; तो फिर इस क्षेत्र में तुम्हारा मंगल साधन कौन करेगा? सद्गुरु प्रदत्त कर्म ही प्रकृत सद्गुरु होता है, हालाँकि वह कर्म और भी निपुणता से हो सके इसके लिए गुरु-स्थान पर आकर बीच-बीच में साधन करना चाहिए। जहाँ देही गुरु विराजित रहते हैं वहाँ सर्वदा भगवत्-कृपा वर्षित होती है। इसका कारण यह है कि सद्गुरु भगवान का अवतार होते हैं। यह बात बहुत पुराने समय से महात्मागण कहते आ रहे हैं। 'सद्गुरु' पद पर सभी अधिष्ठित नहीं हो सकते। ब्रह्माण्ड के समग्र महात्मा मण्डल द्वारा निर्वाचित होकर, अभिषिक्त होकर सद्गुरु जगत् में जीव का कल्याण साधन करने आते है। बहुत भाग्य से मनुष्यों को 'सद्गुरु' प्राप्त होते है। इसीलिए तुमलोगों से कहती हूँ, मुनि-ऋषियों की साधना इस ब्रह्मविद्यारूपी क्रियायोग को प्राप्त कर, नित्य साधना में व्रती होकर तुमलोग अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करो।

''गुरु-गुरु करते हैं केवल गुरु कितने जन पायेंगे?
जो मन चाहे गुरु कृपा उसके भीतर डुबकी लागायेंगे।''

(*श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

नित्यसिद्ध महात्मा के दिव्य दर्शन में – श्रीरामकृष्णलीला

श्री विष्णुपद सिद्धान्त ठाकुर

गतांक से आगे–

(२६)

संध्या आगत है, अड़ोस-पड़ोस के घरों से शंख-घण्टों की आवाजें सुनाई देने लगी, मन्दिर में प्रतिमा की आरति के वाद्य बजने लगे, भक्त पुरुष-महिलाओं से मन्दिर प्रागंण खचाखच भरा है किन्तु रामकृष्णदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। आकाश मेघाच्छादित है, बीच-बीच में विद्युत् चमक रही है, यहाँ तक कि मन्दिर में भी विद्युत् की झलक फैल रही है परन्तु रामकृष्णदेव का उस तरफ ध्यान ही नहीं है। वे गंगातीर पर खड़े हुए, अनन्त मेघों की ओर ताकते हुए, अश्रु जल बहाते हुए कह रहे हैं – ''माँ! माँ! तुम बादलों में रहकर उनसे ही लुका-छुपी खेल रही हो? चिरदिनों तक क्या ऐसे ही खेल खेलती रहोगी? मेघ पुंज तो तुम्हारे पीछे-पीछे भाग रहे हैं, क्या उनकी ओर नजर उठाकर भी थोड़ा नहीं देखोगी? सिर्फ विद्युत् की हँसी देखकर ही छुपती रहोगी? मेघ भी तो तुम्हारी ही छाया हैं, तो फिर वे तुम्हारी काया के साथ कब एकाकार होंगे? माया का आवरण भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है। उनका माया का आवरण हटा दे माँ!'' यह कहते-कहते रामकृष्णदेव अपना बाँया हाथ वक्ष पर रखकर दाँया हाथ ऊर्ध्वगामी कर जड़समाधिस्थ हो गये।

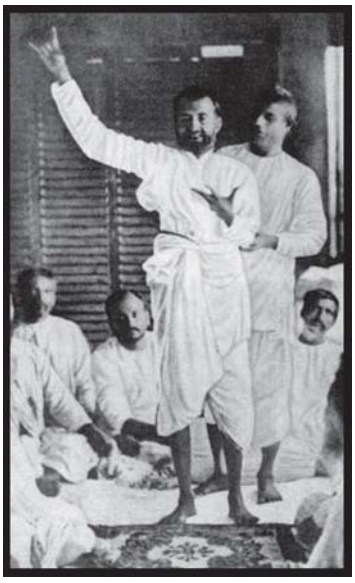

राधा की वह बात भी स्मरण में आ जाती है, जब वे जमुना में जल भरने जाती है तो, जमुना के काले जल में श्याम का दर्शन पा कर गा उठती हैं –''श्याम निरखि जमुना जल में, कैसे पाँव बढ़ाऊँ? श्याम के सिर स्पर्श करे मेरा चरण, कैसे देह भिगाऊँ?''

श्रीचैतन्य महाप्रभु समुद्र दर्शन कर ऐसे ही रो पड़े थे ''हरिगुण गाय आकाश और हवा में, सागर-जल में हरि;

कृष्ण गुण गाय नील-सागर में, आहा! आहा! कितनी माधुरी!''

मानव प्रकृति में ही विश्व प्रकृति छिपी है। अनन्त आकाश में जैसे अनन्त चाँद छुपे रहते हैं एवं शान्त नि:स्तब्ध रात में ही वह ज्यादा प्रकाशित होता है मानवात्मा की नीरव स्थिति में परमात्मा का मिलन घटित होता है। इस नीरव पूजा को ही साधना कहा जाता है। निराली पूजा में मानव प्रकृति जग उठती है। सूर्य उदय होने पर जैसे सुप्त मनुष्य एवं जीव जगत् जग उठते हैं एवं स्व-स्व कर्म में उद्यत होते हैं निर्जन व निराला आराधना में मानव प्रकृति भी वैसे ही जग उठती है एवं विश्वप्रकृति के साथ एक एक कर मिलती जाती हैं, इसे ही साधना कहते हैं। अन्तर की एक-एक प्रकृति जब वाह्य प्रकृति के साथ एकाकार हो जाती है, तब मानव अज्ञान या जड़त्व को प्राप्त होता है। ध्यान धारणा में मानव के देहस्थित एक-एक अंग की एक-एक प्रकृति वहिर्जगत् की एक-एक प्रकृति के साथ जितनी एकाकार होती जाती है, उतना ही वे जड़त्व को प्राप्त करती हैं या जड़ समाधि की ओर अग्रसर होती जाती हैं।

रामकृष्णदेव की आत्मा अनन्त के साथ विलीन हो जाती थी, उसी के प्रतीक रूप में हम उनके दक्षिण हस्त को उस अनन्त की ओर प्रसारित देखते हैं परन्तु, जिन्हांने इस अनन्त की ओर स्वयं को विलीन कर दिया एवं फिर पार्थिव जगत् में लौटकर आये हैं, केवल उनका ही वामहस्त वक्ष पर विन्यस्त रहता है या मुट्ठी बन्द कर तीन अंगुलियाँ खुली रहती है, इसे ही पूर्ण जागरण कहते हैं। ''ॐ'' मन्त्र में जैसे तीन ब्रह्मध्वनि यथा अ,उ,म निहित है वैसे ही मानवात्मा के मध्य भी सत्व, रज:, तम; स्वर्ग, मर्त्य, पाताल या सृष्टि, स्थिति, लय रूप विराजित है। आत्मा के साथ परमात्मा के मिलन से ये तीन ब्रह्मध्वनि जग जाती है; उसी की प्रतीक छवि हम रामकृष्णदेव के दक्षिण या वाम हस्त में देख सकते हैं इस 'अ' ध्वनि को कहते है अशरीरी, 'उ' ध्वनि को कहते है उतरोल एवं 'म' ध्वनि को कहते है 'मन्दिर में', ''ॐ''

मन्त्र के जागरण या आत्मा के जागरण को ही 'अशरीरी उतरोल मन्दिर में' कहते है; अर्थात् – आकाश से मेघ हट गये हैं और सूर्य निकल आया है।

इस ''ॐ'' मन्त्र के साथ या आत्मा के साथ जो और भी नौ प्रकृति सुप्त रहती है उन्हीं के नाम मन्त्र को भूः, भुवः, स्वः, तत्-सवितुर्वरेण्यं, भर्गो, देवस्य, धीमहि धीयो योनः एवं प्रचोदयात् अर्थात् काली, तारा, षोड़शी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी एवं कमला। ये दश महाविद्या दश दिशा या दश ग्रह के नाम भी हमारी आत्मा के जागरण से जागृत हो उठते है। दस दिशाओं की विश्वप्रकृति के निज शरीरस्थ दस अंग उस विश्व प्रकृति के आलोक से आलोकित हो पड़ते हैं। आलोक के साथ आलोक का मिलन होने से ही, जिसे हम स्थूल देह कहते है, वह पड़ी रह जाती है, (या क्षय हो जाता है)। रामकृष्णदेव भी इसीलिए यहीं उन दस दिशाओं के आलोक-प्रकृति के साथ निज शरीर के दस अंग, यथा - हाथ, मुँह, नाक, आँख, कान वक्ष, पेट, सिर व पाँव - पीठ के साथ सम्मिलित होकर, उस एक शक्ति में लीन हो गये हैं। आलोक के साथ आलोक मिल गया है। प्रकृति (स्वभाव) तब इतनी प्रेम विह्वल हो उठती है कि उस अवस्था में सभी को ''हरि'' बोध करते हुए आलिगंन करने की इच्छा होती है। इस अवस्था में रामकृष्णदेव की अन्तरात्मा विश्वप्रकृति के साथ एकीभूत हो जाती थी। समस्त विश्व में वे अपनी ही छवि देखते इसीलिए सभी को अपना ही अंग समझकर स्नेह दे सकते थे। इसे ही कहा जाता है विश्वप्रेमिक, विश्वप्रकृति या वही हैं राधाशक्ति नामधारी आदि-जननी। वे अपने अन्दर आद्या माँ का दर्शन करते एवं उसीका प्रतिबिम्ब प्रत्येक नर-नारी यहाँ तक कि प्रति जड़ या जीव के मध्य सन्दर्शन करते; इसीलिए समस्त सृष्टि को ही वे ''माँ'' कहकर सम्बोधन कर सकते थे।

ऐसे ही नशे के घोर में उनके चौबीस घण्टे अतिवाहित होते और ऐसी समाधि भंग होने के पश्चात् वे जो बोलते वह सुनकर लगता मानों विश्वजननी ही बातें कर रही हों! उदाहरण स्वरूप, ऐसी अवस्था के बाद एकदिन अपने समक्ष विवेकानन्द को देखकर कहने लगे –''माँ, तुम छल से ऐसे घुंघट डालकर क्यों आती हो? ऐसा लगता है मानों यह तुम्हारी माया का आवरण है!'' यह कहते-कहते वे विवेकानन्द के चरणों पर पछाड़ खाकर गिर पड़े। विवेकानन्द के चक्षुओं में भी उसदिन इतना अश्रुप्लावन हुआ कि वे भी मूर्च्छित या पूर्ण ध्यानस्थ होकर प्रायः एक घण्टे तक मूढ़वत् बैठे रहने के लिए बाध्य हुए।

वास्तविक जगत् के साथ, मेलजोल के संग-संग उनका कथोपकथन कुछ बदल जाता एवं पारिपार्श्विक आत्मा के साथ अपनी आत्मा का विनिमय योग होता, इसीलिए कभी कहते ''पांकाल मछली की तरह संसार में वास करना पड़ता है, जिससे शरीर पर कीचड़ न लगे''; दूसरी ओर फिर कहते ''कामिनी कांचन जो है वही मेरी माँ भवतारिणी है, उसका क्या कभी त्याग किया जा सकता है?'' माँ ही ये सब का मोड़ घुमा देती हैं। जीवजगत् के संग युक्तभाव में किसी को उपदेश देते, ''गुरुनिन्दा सुनकर, चुपचाप चले आऐ?'' फिर किसी दूसरे से कहते ''गुरुनिन्दा कोई करता है या सुनता है तो उससे तुमको क्या मतलब है?''

गृहभेदानुसार जैसे सूर्य का आलोक सब ओर समान नहीं रहता, वैसे ही आधार भेद अनुसार अवतार अंग रूप भी बदल जाते है; अतः कंठध्वनि या मुखनिःसृत वाक्य भेद भी लक्षित होते है। जैसे अनन्त सागर का जल जिस पात्र में रखा जाता है वह उस पात्र का ही आकार धारण कर लेता है, परमब्रह्म का रूप भी वैसे ही मानवात्मा के संग युक्त होकर मानवात्मा की ही मन की बात कह जाते है, इसीलिए उनका एक दूसरा नाम है 'अन्तर्यामी'।

रामकृष्णदेव इस शक्ति के ही प्रकाश स्वरूप है, इसीलिए एकदिन स्वामीजी से पूछने लगे ''तुम निराले घर में बैठकर, पोथी पढ़ते-पढ़ते हठात् मुझे देखकर रोने क्यों लगे? यहाँ तो मुझे देखकर इतना नहीं रोते हो? बोलो तो, तुम तब किसे देखते हो? मुझे या माँ को?''

नरेन रोते-रोते कहने लगे –''मैंने अभीतक तुम्हारी माँ को देखा नहीं है, सिर्फ तुम्हें ही देखता हूँ और तुम्हें ही पहचानता हूँ।''

...क्रमशः

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (२३) : हमलोगों के गुरुदेव श्रीश्रीबाबा जो त्रिकालदर्शी थे अर्थात अतीत में जो घटित हो चुका था, वर्तमान में जो चल रहा है, एवं भविष्य में जो होगा, यह सब बाबा के आँखों में मानों 'लघु-चित्रपट' के सदृश उद्भासित होने लगता। इस त्रिकालदर्शिता की कई घटनाओं में से एक घटना को आपलोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। –

किसी एक शाम को हम सभी कई व्यक्ति बाबा के पास बैठे थे। ऐसे में अचानक, बापीदा (श्रीअमरनाथ मुखोपाध्याय) श्रीश्रीबाबा के निकटतम एक क्रियान्वित संतान, ने बाबा को प्रणाम कर कहा, ''दादा, आगामी कल मैं पंडीचेरी महर्षि अरबिन्द के आश्रम जा रहा हूँ; आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि सकुशल रह सकूँ।'' बाबा ने काँपते हुए हाथों से आशीर्वाद देते हुए कहा, ''तुम वहाँ चार दिन से ज्यादा नहीं ठहर पाओगे, चार दिन के बाद तुम्हारे घर से तार (टेलिग्राम) जाएगा और उसके दूसरे दिन ही तुम्हें लौटना पड़ेगा, परन्तु लौटने में तुम्हें कोई असुविधा नहीं होगी।'' ये बातें सुनकर बापीदा ने कहा, ''आप तो साथ हैं तो मुझे कैसी चिन्ता।'' – यह कहकर बापीदा अपने गृह लौट आये। अब इसके बाद की घटना बापीदा के शब्दों में उनके मुखारबिन्द से सुना जाय –

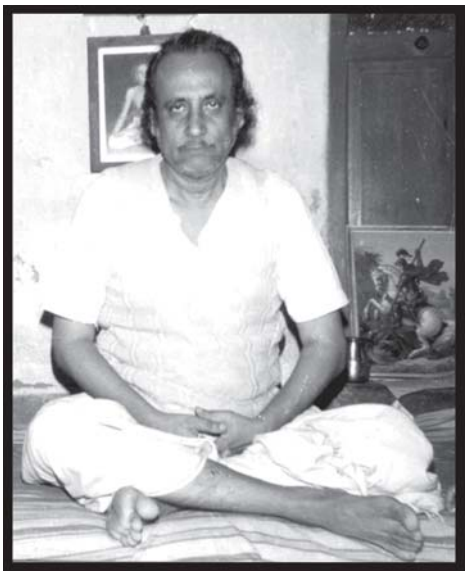

''मैं तो ठीक-ठाक रेलगाड़ी द्वारा वहाँ पहुँचा। प्रथम तीन दिनों तक आश्रमस्थ एक झोपड़ीनुमा घर में अवस्थान किया, जहाँ से रोज सुबह ऋषि अरबिन्द की समाधि पर जाता तथा विशेष आदेश से समाधि भवन की दूसरी मंजिल पर बैठकर गभीर भाव में ध्यान करता, एवं साथ-साथ अंर्तमुखी क्रियाएँ भी संपादित करता। इसके अतिरिक्त समुद्र तट पर घुमता तथा हमेशा मन के भीतर ध्यानावस्था में रहता। ठीक चार दिनों के पश्चात्, मेरे घर से विशेष कारण वश मुझे लौट आने हेतु एक तार (टेलिग्राम) संप्रेषण किया गया। वास्तव में तभी मैं 'अपरिपक्व मैं' था, 'परिपक्व मैं' में परिणत नहीं हो पाया था। जो भी हो, मैं तो यहाँ पर पंद्रह दिनों तक प्रवास हेतु आया था, तदनुसार ही मेरा वापसी टिकट बनाया गया था। फिर भी दूसरे दिन प्रातः ही मैं जल्दी-जल्दी स्टेशन पहुँचा। जहाँ पर वापसी का टिकट पाना एक अति दुरूह कार्य था। तब यदि मैं गुरुदेव की वाणी पर विश्वास रखता तो उस समय मुझे विशेष भाग-दौड़ नहीं करना पड़ता अथवा तनाव-ग्रस्त नहीं होना पड़ता। हठात् स्टेशन पर एक व्यक्ति ने स्वयं मुझसे आकर बातचीत करना प्रारंभ किया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह भद्र पुरुष और उसके एक मित्र ने एक साथ टिकट बनवाया था (two-tier reserved ticket)! उनका गंतव्यस्थल था भुवनेश्वर, जहाँ वे व्यापार संबंधी कार्य हेतु जा रहे थे। परन्तु पारिवारिक समस्या के कारण उनका मित्र नहीं आ पाया। इसीलिए गुरुदेव का नाम लेकर उस अपरिचित मित्र के नाम से ही मैंने यात्रा प्रारंभ की। उस व्यक्ति का नाम संभवतः 'मनोज पाण्डे' था। हमारी गाड़ी कोरोमंडल-सुपर-एक्सप्रेस सुबह आठ बजकर तीस मिनट पर रवाना हुई! केवल उस भद्र पुरुष का साथ ही नहीं मिला वरन् पूरी यात्रा में उन्होंने मेरी बहुत सेवा यत्न की। न जाने कितने प्रकार के शाकाहारी भोजन उन्होंने परोसे, तथा बहुत सारी मनोरंजक बातें की। रेलगाड़ी द्रूतगामी एक्सप्रेस थी इसीलिए मात्र तीन पड़ाव थे। संभवतः सेन्ट्रल-मद्रास, विजयवाड़ा, वाल्टेयर एवं भुवनेश्वर। रेलगाड़ी का गंतव्य हावड़ा तक था, रेल-टिकट-परीक्षक से टिकट के हावड़ा तक का विस्तार करने के लिए कहने पर उसने कुछ मुद्रा विनिमय की बात कही। तत्पश्चात् रात के बारह बजे भुवनेश्वर पहुँचने पर, उस सज्जन व्यक्ति ने मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापन किया एवं रेलगाड़ी से उतर पड़े। उस भद्र पुरुष को आभार प्रकट करते हुए मैंने उनका सामान प्लेटफार्म तक पहुँचा दिया। पुनः वह

(विस्तारित) टिकट लेकर हावड़ा की ओर चला। दूसरे दिन बारह बज कर तीस मिनट के लगभग सांतरागाछी स्टेशन आने से पूर्व यानि कि बागनान स्टेशन के निकट से ही गुरुदेव को जप करते हुए कहने लगा, कि गाड़ी सांतरागाछी स्टेशन आते ही कुछ मिनटों के लिए ठहर जाय, क्यों कि गृह से तार आने से मेरा मन बहुत चंचल हो गया था, और उस समय आज की तरह सचल-दूरभाष (मोबाईल फोन) नहीं थे। जो भी हो गुरुदेव की इच्छा से सांतरागाछी आते ही रेलगाड़ी रूक गयी कारण पता चला, 'इंजन में आयी सामयिक तकनीकि खराबी'; ट्रेन के रूकते ही मैं थैला एवं सामान लेकर उतर पड़ा, जैसे ही मैं सरो-सामान के साथ घर के लिए रिक्शा से प्रस्थान किया, आश्चर्यजनक रूप से रेल पुनः चल पड़ी!

सायंकाल में मेरे गुरुदेव के पास पहुँचते ही वे बोल उठे –''बापी ने सारे दिन आश्रम में ध्यान एवं क्रिया संपन्न किया है, इसतरह के क्रियाबान लड़के जो चाहेंगे वहीं होगा, ऐसा होना ही पड़ेगा।

प्रसंग (२४) : गुरुभाई आशीषदा (श्रीआशीष बनर्जी) अवकाशप्राप्त (केनरा बैंक) अभिकर्मी, एक उत्कृष्ट क्रियान्वित व्यक्ति। लाहिड़ी बाबा के साथ मेरे सान्निध्य के पूर्व से ही आशीषदा का गुरुमहाराज के पास आनाजाना था। समय निकाल कर नियमित रूप से वे प्रतिदिन दोबार बाबा के दर्शन हेतु जाते। मैं जानता था कि कईबार सुबह बैंक जाने से पहले पंप-कल से जल ले आते समय जल्दी-जल्दी आधे घंटे हेतु बाबा के पास हो आते। ऐसे बहाना बनाने का कारण था कि आशीषदा के पिताजी बहुत गंभीर प्रकृति के एवं क्रोधी पुरुष थे, उनकी धारणा थी कि वह एक तांत्रिक का स्थान है। इसीलिए हमेशा वे उनको जाने से रोकते। अभी भी आशीषदा श्रीश्रीबाबा के भाव में भावस्थ रहते है एवं बाबा की बातें करते-करते मानों वे कहीं खो से जाते है। उनके चेहरे पर एक अपूर्व आनन्द खेल जाता। ये आशीषदा बाबा के प्रति-मुहूर्त्त के साक्षी। अब कुछ घटनाओं का वर्णन आशीषदा के मुँह से सुना जाय –

अहंकार शून्य होकर मनुष्य से श्रद्धा करना –

प्रतिदिन की तरह एक रविवार को मैं (आशीष बनर्जी), असीम दा और भी कई व्यक्ति अपने दादा (श्रीश्रीबाबा) के पास बैठे थे। दादा हमलोगों के सम्मुख ही चारपाई पर भावस्थ बैठे हुए वार्त्तालाप कर रहे थे। उसी समय बाबा के घर के समक्ष एक निजी गाड़ी आकर रूकी- उसमें से एक गौरवर्ण व्यक्ति (आयु प्रायः ७० वर्षीय) उतरे, उनके साथ चालक 'मोतीलाल' जो बाबा के परिचित थे एवं कभी-कभी बाबा के पास आया करते, ये दोनों व्यक्ति आकर बाबा के समीप बैठे। दादा ने भद्र व्यक्ति का कुशल क्षेम पूछा, तत्पश्चात् कुछ अन्य बातें करने लगे। दादा यह समझ रहे थे कि वह भद्र व्यक्ति पैर की पीड़ा के कारण ठीक प्रकार से (cross-sit position) बैठे नहीं पा रहे थे। किन्तु वे बार-बार ठीक प्रकार से (पालथी मारकर) बैठने की चेष्टा कर रहे थे, फिर भी उनका पैर हट जाता था। यह देखकर उस समय दादा ने परम स्नेह युक्त वचन कहा, ''दादा, पैर को उठाकर पालथी मारकर बैठने का प्रयास कीजिए, मैं कहता हूँ आप यह कर पायेंगे।'' वह भद्र पुरुष दादा की बात सुनकर हिम्मत जुटाकर उस प्रकार बैठने का यत्न करने लगा, परन्तु पैर को उस अवस्था में स्थिर नहीं रख पा रहे थे। अकस्मात् मोतीलाल व्यंग्य भरे रूप में, डाँटते हुए उस भद्र व्यक्ति से कहने लगा, ''अति साधारण कार्य आप से संभव नहीं हो पा रहा है, मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ, आप भी ठीक उसी प्रकार करें।'' यह कह कर चालक मोतीलाल उस भद्र व्यक्ति की तरह पाँव फैलाकर, फिर उसे मोड़कर पालथी की तरह बैठने की कोशिश करने लगा, किन्तु किसी भी प्रयास से वह अपना दाहिना पाँव मोड़कर बाँये पाँव पर प्रतिस्थापित नहीं कर सका। उसने कई बार प्रयत्न किया, परन्तु फिर भी पाँव को यथास्थान मोड़कर रख नहीं पाया। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके पैर को फर्श से चिपका दिया हो! मोतीलाल का मुँह शर्म से लाल हो गया। एवं तब मैं (आशीष) और असीम-दा इस घटना का रहस्य जानकर, एक दूसरे का मुँह देखने लगे। यह देखा कि मोतीलाल के आँखो से आँसू बह रहे हैं। दादा निर्विकार, उदासीन भाव में उनकी तरफ देख रहे थे। कुछ मिनटों के पश्चात् दादा ने मोतीलाल की तरफ संकेत कर कहा, ''मनुष्य को श्रद्धा तथा सम्मान प्रदान करना ही यथार्थ मनुष्य का परिचय है।'' *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिबपुर, हावड़ा
हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

सूर्यवंशीय नृपति सत्यविक्रम

आदिकल्प में 'सत्यविक्रम' नामक सूर्यवंशी एक राजा थे। दैवदुर्विपाक से शत्रुओं द्वारा हृतराज्य होकर नृपति सत्यविक्रम ब्रह्मर्षि गुरु वशिष्ठदेव के आश्रम में उपनीत हुए। वहाँ उनकी यथोचित वन्दना कर, किस उपाय से वे पुनः अपने राज्य को प्राप्त करेंगे, तद्विषयक उपदेश हेतु प्रार्थना की। वशिष्ठदेव ने उन्हें महाकाल वन में जाने का आदेश देकर वहाँ अवस्थित एक अद्‌भूत तापस से उस विषय पर परामर्श लेने की सलाह दी। तब सत्यविक्रम ने वशिष्ठदेव की मन्त्रणा पर महाकाल वन में गमन किया तथा वहाँ उस अद्‌भूत तापस का अवलोकन किया। तब उस तापस ने भी राजा को देखकर परम समादर प्रदर्शन कर अकस्मात् भीषण हुंकार भरी। उस अत्यद्‌भूत तापस के 'हुंकार' (हुंकार रूप नादब्रह्म या चिन्मय ध्वनि जो थी सृष्टि का बीज स्वरूप) करते ही भूमितल भेद कर पाँच अति परमासुन्दरी कन्याएं प्रस्तुत हुई।

उन पाँचो के मध्य एक के हस्त में कनक निर्मित पीठ; एक के हस्त में जलपूर्ण भृंगार; दो चँवर डुलाती अंगनाये; वे ससम्मान राजा सत्यविक्रम के दोनों पार्श्व में दण्डायमान हुई एवं पंचम कन्या नृपति के पदद्वय प्रक्षालन के निमित्त उद्‌ग्रीव हुई। यह पंचकन्या 'पंचतत्त्व' की रूपक प्रकाश है; पंचतत्त्व अर्थात् क्षिति, अप, तेज, मरूत और व्योम द्वारा हम लोगों की देह निर्मित हुई है। उस तापस ने पुनराय 'हुंकार' ली। तभी देवलोक से अप्सराएं नृत्यगीत करते-करते वहाँ उपस्थित हुई। साथ-साथ में एक परम ज्योतिर्मय शिवलिंग भी (समग्र ब्रह्माण्ड के रूप 'लिंगज्योति') उस स्थल पर आविर्भूत हुआ।

तब इन समस्त परमाश्चर्य घटनाओं का अवलोकन कर राजा ने तापस से इन सभी रहस्यों का कारण पूछा। तापस ने कहा कि ये सभी उनकी तपस्या के प्रभाव से संभव हुआ है। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि उस ज्योतिर्मय लिंग की आराधना कर ऐसी असामान्य क्षमता को लब्ध किया है। इतना कहने के पश्चात् उन तापस ने पुनराय एक हुंकार ली एवं तभी उनके मुखविवर से हुताशन ने आविर्भूत होकर चराचर परिव्याप्त कर दिया। उसके पश्चात् उस महातापस ने उस मुखनिःसृत अग्निज्वाला को प्रसमित कर हुंकार द्वारा वायु-प्रवाह की सृष्टि की। तब और कुछ दृष्टिगोचर नहीं हुआ। सत्यविक्रम हत्‌बुद्धि होकर चहुँओर दृष्टिपात करने लगे। उसी समय एक भीषण शब्द हुआ एवं प्राकारादि-परिवृत, सुवर्णमय अट्टालिकादि समन्वित जनसंकूल एक महानगरी प्रादुर्भूत हुई! तत्पश्चात् पुनः एक महान शब्द हुआ एवं दो नारियाँ दृष्टिगोचर हुई। उनमें से एक शुभ्रवस्त्र, दूसरी कृष्णवस्त्र परिहिता थी। फिर से एक महान् शब्द उत्थित हुआ, उसके साथ ही द्विमस्तक षड़ानन एवं द्वादसपद विशिष्ट एक पुरुष प्रकट हुआ। पुनराय शब्द हुआ एवं और एक पुरुष आविर्भूत होकर सप्तभाग में विभक्त हो गये। इस प्रकार उस तापस ने राजा के समक्ष अपनी तपस्या की अलौकिक क्षमता का प्रदर्शन कर राजा का कौतूहल उपशम करने के लिए निम्नलिखित रूप से समुदय विषय का अर्थ समझा दिया –

शुभ्र और कृष्णवर्ण वस्त्र परिहिता नारीद्वय थी दिवा एवं रात्रि। उस अद्‌भूत आकृति-विशिष्ट पुरुष के मुखद्वय दो अयन (वामावर्तन और दक्षिणावर्तन), छः मुख - छः ऋतु; द्वादस पाद - द्वादस मास। अन्य और एक जो पुरुष उत्पन्न हुए थे वे सप्तभाग में विभक्त हो गए, वे हैं सात समुद्र। इस प्रकार रूपकाकार में तापस ब्राह्मण ने संवत्सर प्रदर्शन कर कहा कि राजा यदि उस ज्योतिर्लिंग की सात्विक आराधना करे तो वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने में सक्षम होंगे। तब राजा सत्यविक्रम ने उस तापस के उपदेशानुसार शिवलिंगार्चना कर पुनराय अपने राज्य को प्राप्त किया।

(*स्कन्द पुराण के आवन्त्य खण्ड से संग्रहित*)

–संकलन श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आगामी अनुष्ठान सुची

बुद्ध पूर्णिमा - २१ मे, शनिवार
अध्यात्मिक सभा – १९ जून, रविवार
गुरु पूर्णिमा – २६ जुलाइ, मंगलवार

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्रीअमरेन्द्र चन्द्र श्याम कृत 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन कथा है 'वृहत् किशोरी भागवत्' ग्रंथ। इसके अंतरगत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

पत्र संख्या (१)

ॐ

ई० १० जून १९३८

काशीधाम

श्रीमान् क्षितीश, परम् कल्याणीयेषु,

तुम्हारा पत्र पाकर आनन्दित हुआ। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। यथा – सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म के अभ्यंतर में स्पंदन होता है। तत्पश्चात् स्वभावत: ब्रह्म से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की उत्पत्ति होती है। वे माया से संयुक्त होकर स्वत: निज देह को प्राप्त करते हैं। इसी माया के मलिनावस्था को अविद्या कहते हैं। उस में तम:शक्ति – आवरण शक्ति, रजोशक्ति – विक्षेप शक्ति एवं सात्त्विकीशक्ति है प्रकाश शक्ति। यह मलिन माया या अविद्या जैसे जीव के बंधन का हेतु बनती है, विशुद्ध सात्त्विकी माया वैसे ही मोक्ष का हेतु बनती है। चैतन्य माया संयुक्त होकर स्वयं को जिस-जिस आकार की कल्पना करती है उसी समय उन सारे आकारों का सृजन हो जाता है। आरंभ में जीव समष्टि चित्त अवस्था में रहता है, तत्पश्चात् संकल्पित होकर व्यष्टि भाव में नाना-प्रकार के जीव ग्रहण करता है। चैतन्य माया संयुक्त होने पर तब मन और अहंकारादि उत्पन्न होते हैं। तत्पर वे स्वयं को इन्द्रिय संयुक्त सूक्ष्म देहरूपी कल्पना कर वैसा ही बन जाते है। अविद्यावश आत्मबोध शून्य होकर ही चैतन्य की जीवत्व प्राप्ति होती है। प्रारंभ में सूक्ष्म या अतिवाहिक देह प्राप्त कर, तत्पश्चात् निज को जड़ भावना करता है। वह क्रमश: स्वयं को शब्दतन्मात्रा, स्पर्शतन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा, गंधतन्मात्रा रूप में विचार कर उन-उन रूपों में उत्पन्न होता है। बाद में आकाशतन्मात्रा में अवस्थित होकर स्वयं को सूक्ष्म आकाशरूप में विचारने पर आकाशतत्त्व की उत्पत्ति होती है।

ऐसे सूक्ष्म आकाशतत्त्व रूप में कल्पना कर सूक्ष्म वायुतत्त्व रूप में उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार वायुतत्त्व में स्थित होकर सूक्ष्म अग्नितत्त्व रूप में एवं सूक्ष्म अग्नितत्त्व में स्थित होकर, सूक्ष्म रसतत्त्व रूप में एवं उस में अवस्थित होकर सूक्ष्म पृथ्वीतत्त्व रूप में उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात् पंचसूक्ष्मभूत या महाभूत के पंचीकरण यथा पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश इन पंचमहाभूतों में से प्रत्येक को दो समान भाग कर प्रत्येक के एकार्द्ध भाग को पृथक कर, अन्य अर्द्धभागों को समान रूप से चार भागों मे विभक्त करते हैं। फिर सबों के निज अर्द्धांश एवं अन्य चार भूतों में से प्रत्येक के अन्य अर्द्धांशों के एक चतुर्थांश को मिलाकर पूर्ण अंश रूप से एक-एक स्थूल भूत उत्पन्न होते है। तब चैतन्य विराट् स्थूल देह एवं विराट् सूक्ष्म देह युक्त होकर विराट्-पुरुष रूप में परिणत होते हैं। तब वे संकल्प द्वारा स्वयं को बहु जीव रूप में कल्पना कर व्यष्टि भाव में क्षुद्र-क्षुद्र चित्त ग्रहण कर नाना प्रकार के जीव बन जाते है। अहंकार मन से आरंभ कर स्थूल जड़ भावापन्न समस्त जगत् ही समष्टि चित्त द्वारा कल्पित होकर उसी चित्त में ही स्थित होता है। स्थूल, सूक्ष्म समस्त जगत् ही मिथ्या है। अतएव समस्त ही है कल्पना प्रसूत। ब्रह्म सर्वव्यापी। उनका सर्वत्र अस्तित्व होने से मिथ्या वस्तु भी सत्यवत् प्रतीत होती है किन्तु वस्तुत: ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म के अलावा जगत् कहकर कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जीवरूप धारण कर अविद्यावृत होकर निज स्वरूप को विस्मृत कर देते हैं। एवं क्रमश: अत्यधिक तमसावृत होकर स्वयं के जन्म, मृत्यु, शोक, दुखादि की कल्पना कर दुर्दशा को प्राप्त होते हैं। चित्त के स्वच्छता युक्त होने पर आरंभ में जो कुछ कल्पना किया गया वही घटित हुआ। अभी चित्त के अत्यंत मलिन होने से, मैं यह चित्त, मेरी यह काया इत्यादि भ्रम में पतित होकर विभिन्न प्रकार के चित्त दोषों से स्वयं को उस-उस भावापन्न कल्पना करते हैं। तब पुन:

उनकी इच्छानुयायी कार्य संपन्न नहीं होते। कालान्तर में वे किसी प्रकार साधु, महात्मा या सद्गुरु का संगलाभ कर; कामना, वासना विद्वेषादि समस्त चित्तदोषों को क्रमशः स्खलन कर स्वकीय पूर्वरूप क्रमशः प्राप्त कर निजरूप ब्रह्मरूप में अवस्थित होते हैं। चैतन्य का परिणाम या परिवर्त्तन कदाचित नहीं होता। वह सब कल्पना मात्र है। चैतन्य हमेशा स्वकीय स्वभाव में स्थित है। वह नित्य मुक्त स्वभाव। जीव का चित्त जब विशुद्ध सत्त्वमय होता है, उसी समय आत्मबोध स्वभावतः उद्भासित होता है। तब उसके संकल्पबल से कार्य संपादित होते है। चित्त द्वारा ही चित्तमल स्खलित किया जाता है। प्रथमतः अष्टांगयोग, भक्तियोगादि द्वारा चित्तमल का अपसारण होता है। तत्पश्चात् मोक्ष शास्त्र अध्ययन, आत्म-अनात्म विचार, तत्त्वोपदेश श्रवणादि द्वारा जीव का प्रकृत स्वरूप ब्रह्मचैतन्य उद्भासित होता है। चित्त विशुद्ध होकर स्वयं प्रकाश आत्मा निज को स्वयं प्रकाशित करती है। यही है जीव का कल्पित मोक्ष। चैतन्य का बंधन या मोक्ष दोनों ही कल्पित हैं स्वयं को ब्रह्मरूप समझना; आत्मध्यानादि, भवरोग की प्रसिद्ध दवा है। तब अद्वैतभाव में जीव प्रतिष्ठित होता है एवं उसके कलेवर का अस्तित्व होते हुए भी वह निर्वाणमुक्ति लाभ करता है। सृष्टि के पश्चात् उस चैतन्य के संस्थान इत्यादि के संबंध में जिसने जिस भाव में कल्पना किया, अभी भी जीव उसी अनुरूप उसे देख रहा है। मूल समष्टि चित्त की कल्पना के संबंध में अभी भी जीव को जगत् भ्रांति हो रही है। यही है नियति। इसी प्रकार भवितव्यता भी जगत् में क्रीड़ारत है। पुरुषकार प्रयोग द्वारा जीव अपनी मुक्ति स्वयं ही संपादित करता है। तुम सबों को मेरा आशीर्वाद है।

इति–

किशोरी मोहन

पुनः – **कर्म व कर्मफल**

सूक्ष्म देह और स्थूल देह द्वारा कर्म संपादित होते है। इन उभय देहों की उत्पत्ति अविद्या या अज्ञान वश होती है एवं देह ही जब मिथ्या, तब कर्म एवं कर्मफल भी मिथ्या हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत् में पूर्व संकल्प-बल से सत्य रूप प्रतीत होते है। जब तक अविद्या या अज्ञान रहता है जीव कर्मफल भोगता रहता है। ज्ञानोदय से समस्त कर्मफल भस्मीभूत हो जाते है। परन्तु प्रारब्ध कर्मफल अर्थात जो समस्त कर्मफल भुक्त हो रहे हैं उसका फल भोग देहान्त पर्यन्त होता रहता है, ऐसा कहा गया है। परन्तु ज्ञानी जीव उन समस्त कर्मफलों को निर्लिप्त भाव से भोग करते हैं। वे भोक्ता नहीं है। यही है कर्मफल की मीमांसा। कर्म के फल त्याग करने से पुनः उस हेतु बंधन नहीं होता। यही शास्त्रों में वर्णित है। इति–

किशोरी मोहन

(*बंगला ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्' से उद्धृत*)

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

आश्रम समाचार

११-२२ जनवरी – पुष्कर निवासी सन्त श्रीश्रीटाटबाबा ने अखण्ड महापीठ में कुछ दिन अतिवाहित किए। आश्रम

निवासी भक्तवृन्द उनके पूत सान्निध्य के सौभाग्य को प्राप्त कर धन्य हुए।

१५ जनवरी – श्रीश्रीगुरुमहाराजों के आसन प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर अखण्ड महापीठ आश्रम में वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हुआ। इसी दिन प्रातःकाल श्रीश्रीगुरुमहाराज की पूजा और यज्ञ सम्पन्न हुआ। प्रति वर्ष की तरह होटोर आश्रम के कुछ छात्र-छात्राएँ उस शुभदिन पर अखण्ड महापीठ में उपस्थित थे। प्रत्येक को श्रीश्रीमाँ प्रदत्त उपहार प्रदान किए गए। दोपहर में हमारे गुरुभ्राता और भगिनियों के अथक परिश्रम से अनेक भक्तवृन्दों ने परितृप्तपूर्ण भाव से प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में होने वाले सांस्कृतिक अनुष्ठान

में होटोर के शिशु और बालिकाओं ने प्रादेशिक नृत्य के ऊपर एक मनोरम नृत्यगीतानुष्ठान प्रस्तुत किया। इसके पश्चात् ही

पण्डित गिरिधारी नायेक के 'ओड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों ने भक्तिमूलक विषय पर नृत्य परिवेशन किया। अनुष्ठान के प्रारम्भ में 'हिरण्यगर्भ' की पूर्ववर्ती संख्या प्रकाशित हुई।

७ फरवरी – श्रीश्रीमाँ की उपस्थिति में इस दिन श्री सुब्रत सेनगुप्त ने रवीन्द्र संगीत परिवेशन किया।

१२-१५ फरवरी – श्रीश्रीमाँ कुछ गुरुभ्राता और भगिनियों के साथ पुरी आश्रम परिदर्शन हेतु गयी। श्रीश्रीमाँ ने वहाँ सिद्धेश्वरी मन्दिर, अद्वैत-ब्रह्म आश्रम और पंचलिंगेश्वर मन्दिर का दर्शन किया। बालिगोयालि में स्थित 'डिवाइन लाइफ सोसाइटी' ने १३ फरवरी को श्रीश्रीमाँ के प्रवचन का एक अनुष्ठान आयोजित किया।

१९ फरवरी – 'योगदा सत्संग सोसायटी' के महंत स्वामी शुद्धानन्दजी अखण्ड महापीठ आश्रम में श्रीश्रीमाँ के दर्शन के लिए पधारे। उपस्थित भक्तों ने सत्संग और श्रुतिमधुर संगीत श्रवण कर यह पावन दिन अतिवाहित की।

२३ फरवरी – इस दिन संध्या में श्रीश्रीमाँ की दीक्षित संतान इमनियाज़अली भाईसाब श्रीश्रीमाँ के दर्शन हेतु आकर यहाँ कुछ समय व्यतीत किया।

२८ फरवरी – श्रीश्रीमाँ आश्रमस्थ कुछ भक्तों के साथ होटोर आश्रम में बच्चों के स्नेह पूर्ण निमंत्रण पर वहाँ गयी। वहाँ श्रीश्रीमाँ की पूजा और आरती के माध्यम से श्रद्धा ज्ञापित की साध्वी सुचेतानन्दमयी और साध्वी पुण्यानन्दमयी ने। आश्रम की ब्रह्मचारिणियों और शिष्याओं ने एक-एक करके श्रीश्रीमाँ को हार्दिक श्रद्धा निवेदन किया। श्रीश्रीमाँ ने शिशुओं के आवासस्थल का अवलोकन किया तथा प्रत्येक को चॉकलेट प्रदान की। निकटस्थ ग्राम के कुछ दर्शनार्थी भी श्रीश्रीमाँ के दर्शनार्थ वहाँ पहुँचे। परिशेष में आश्रम के विद्यार्थियों ने एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान प्रस्तुत किया।

७ मार्च – शिवरात्रि की संध्या में श्रीश्रीमाँ अपने हाथों से एकान्त में शिवपूजा करती है। मध्यरात्रि में यज्ञगृह में श्री यज्ञनारायणदा ने शिवरात्रि का यज्ञ कार्य संपन्न किया।

२० मार्च – आध्यात्मिक सभा के अष्टादश पर्व पर मातृ-संतान डा० वरूण दत्त ने 'ईशोपनिषद् एवं केनोपनिषद्' पर मधुर व्याख्यान का परिवेशन किया।

२३ मार्च – दोलपूर्णिमा के उपलक्ष्य पर दोपहर में श्रीश्रीराधामाधव को भोग निवेदित किया गया। संध्या में शिशु शिल्पी अशोका बासु एवं श्रद्धा दासगुप्त के नृत्य के पश्चात् पं० गिरिधारी नायेक के शिष्यों द्वारा परिवेशित रवीन्द्र-नृत्यनाट्य 'चित्रांगदा' का अनुष्ठान संपन्न हुआ।

२५ मार्च – श्रीश्रीमाँ के आगमन हेतु बहु भक्तवृन्द गुरुभ्राता राजेन्द्र सेठिया के गृह पर एकत्रित हुए थे।

संध्याकाल में संगीत एवं सत्संग के पश्चात् भक्तवृन्दों ने परितृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया।

Kripasindhu Brahmarshi Devraha Baba

Sree Sree Maa Sharbani

During our travels to various places of pilgrimage in North India, I observed that the general impression obtained through folklore is that Valmiki Muni later took birth as Goswami Tulsidas. Again few opinions seemed to indicate that Brahmarshi Devraha Baba was verily sage Valmiki. From the truth rays of my soul's realization during my sadhana, I have direct experience that Goswami Tulsidas and Brahmarshi Devraha Baba are not the same personality. Again Valmiki Muni is also a third separate persona, another great soul. All three are however intricately linked with the epic Ramayana. Through the enlightening rays of my Sadguru Parampara, it dawned upon me that Goswami Tulsidas was actually Brahmarshi Vashishta-dev reborn. Sage Vashishta was a legendary Puranic personality, arguably one of the greatest sages of Indian tradition, who was capable of orchestrating divine leelas. He was the principal teacher in the great treatise Yog Vashishta Ramayana, which is a repository of his teachings on atma-vidya and yogic science. On the other hand, through the divine grace and inner interactions with Sri Sri Devraha Baba, I came to know that he is an ancient soul, Brahmarshi Sanak – one of the four Divine Kumara Sons of Lord Brahma. It is Brahmarshi Sanak, who played the lead role of Maryada Purushottam Lord Sri Rama in the divine play of Ramayana that was enacted through the spiritual power and under the guidance of Sage Vashishta. Again, from inner realizations, I came to know that Maharshi Valmiki, famous as the author of the Ramayana story, was actually the ancient sage Medhatithi, from whose sacrificial fire arose a divine woman whom Rishi Medhatithi named 'Arundhati' and reared her as his divine daughter. Later he gave her hand in marriage to Rishi Vashishta. They are therefore three different sage personalities but connected together in many ways, particularly through the Ramayana.

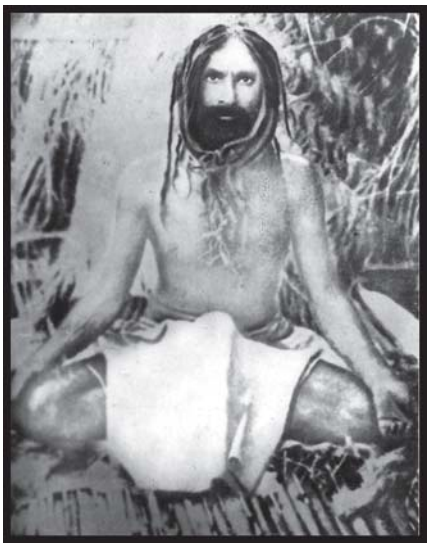

Let me describe my first direct experience with Lord Sri Rama personified Brahmarshi Devraha Baba. It was the year 1987 and I had just moved into my residence in the Salt Lake area of Kolkata. One poor woman, Halima Bibi, used to assist me in my household tasks. Once day when I was preparing for my worship of Sree Sree Adya Maa, she came to me with few beautiful thousand faced Jaba (China rose) flowers saying that she had personally brought them for my Puja. I noticed that they were fresh and well cleaned. Without any other thought, in a self-absorbed state, I took the flowers from her hands and performed my worship. A few days later, I began to feel extreme pain in my stomach. I did not realize that a serious stomach ailment of the woman had been transmitted into me. Earlier, she would come to me expressing her problems with her stomach and after being given medicines would feel temporary relief. She was a poor woman who worked very hard to survive with her three little children and I would feel her sorrow. But it never occurred to me that

this dreaded disease would come to me. During worship, the Kulakundalini Shakti needs to be arisen. During that time touch from another person often causes misfortune to the sadhaka due to transmission and exchange through the touch. Then there is no option other than enduring the disease. In a few days I became bedridden. Weakness and stomach pain was amplified by low hemoglobin levels. Restricted to my bed all day, I constantly prayed to my Sadguru for succor. When medical treatment was of little relief, there was no option but to seek refuge in my Sadguru and Paramguru. Under the circumstances, one night an extraordinary event occurred.

As I lay still in bed with my eyes half open, like in deep sleep or trance, suddenly a reverberating sound 'Hummmm' began. Gradually the vibrating sound increased and it appeared to me that some earthquake event was occurring in the room. As I was about to be absorbed by the experience, someone opened my inner eyes and I began to see and experience the subtle environment around me. A small back circle on the wall near my head began to expand till it formed a large cave-like appearance. The deep 'Hmmm' sound was emanating from this cave and now it was distinct as the sound of Omkar's reverberations. As the sound levels increased I observed an aged personality slowly coming out of the cave – the vibrations seemed to be a part of his embodiment. This ancient persona came out of the cave and sat down near my asana bed. First he raised his hands and spoke in Hindi, 'I have come to you from very far; I have little time now. You have to live some more time for the good of this world. I will soon leave my mortal coil in Vrindavan; I will now go and live on the banks of the river Sarayu. One should accept the illness of another very carefully. Do not repeat this type of incident again.' He then imparted the divine Ram Mantra into my ears. On hearing the mantra, supramental consciousness pulsated and engulfed my whole being. I remained stunned in grateful numbness. The great mahatma then circulated me seven times and then with the dhwani of omkar reentered the cavern and left. From the omkar, the sound of Ram emanated and permeated the whole environment.

I have no recollection of how the rest of the night passed. In the morning, as soon as I awoke, the memory of the divine personality constantly flashed in my mind, and someone within me whispered, 'Brahmavetta Devraha Baba had come. Through his grace you will fully recover.' True to this, from the same day I started feeling better and within a few days I began to move back to normalcy.

Later, one day when Sri Babaji Mahashay (I used to call Sri Saroj Baba by this name) came, I recounted the whole incident to him. Upon hearing everything, he remarked, 'You have a deep connection with Sri Devraha Baba, about which you shall come to know afterwards.' That night only one thought lingered in my mind – 'What is the deep connection with this great saint, whom I have never tried to contact in this life, but who on his own came to me?'

Within a short while, myself along with my family travelled to Varanasi to have darshan of Sri Devraha Baba. We had heard that he was residing in a machaan (uplifted open stage) on the banks of the Ganga near Ramgarh. But it was our misfortune that we were unable to have his darshan during this visit. Due to torrential rains, we were unable to leave our hotel room. At night, in a trance-like dream I saw Sri Devraha Baba telling me, 'You will not be able to meet me. I have come to the banks of the Sarayu.

Soon I will leave my mortal body in Vrindavan'. During the dream, the question crossed my mind – 'What is my relationship with you?' But then my dream broke off and I awoke.

Quite some time after this I came to stay in Parnasree. There one afternoon when I was deep in dhyan during sadhana, in my kutastha omkar dhwani began and I saw an ancient rishi emerging from within. Only his upper body was visible in the inner sky. Seeing him, in my mind I asked, 'Who are you?' In Sanskrit intonation he replied, 'Brahma-putra Sanak'. Soon his body transformed into the image of Brahmarshi Devraha Baba, which then converted to Kaivalyanath Sri Sri Ram Thakur before going back to the original form again. He spoke through emanating thought waves – 'I always remain with you and will be with you forever. Be without fear; you have much to do in this world.' The omkar dhwani slowly petered off and a silence of peace remained. From my inner realizations the following came out to me from the depths of truth – 'Brahmarshi Sanak descended on earth as Lord Sri Rama, carrying with him the supreme divine state of Purna Brahma Narayana, to establish the law of eternal truth'. I then revived my old memorable past experience – 'I found out my deep spiritual relationship with him'. This great soul – an ocean of grace – my avatar-friend, during this Ramayana Leela moved on from Brahmavetta to Brahmasatta – the highest form of human existence. Knowing this, I felt truly blessed and bowed my head in deep reverence. *–Translated from Bengali by*

Prof. Partha Pratim Chakrabarti,
her Blessed Child

The Philosophy of Truth

The Fundamentals of the Mind (Psychology)

Chapter 9

Mahatma continues, "Muktikopanisad asserts to disengage the mind engrossed in unholy matter and turn it towards austerities. It is the nature of the mind to oscillate between the good and bad, between pious and unholy thoughts. The mind needs to be nurtured like a small baby with the help of self-endeavour. O Satyakam! Self-effort is the only tasteful elixir for treatment of the great disorders of the mind. Hence get yourself free from mental weakness and imperfect intellects. Get up, arise and free yourself with your own effort. As you immerse yourself in atma-tattva, with the help of self-effort on the basis of egoistic intellect, your mind will purify and the radiant glow of your Atman will manifest. The Sruti asserts – "*Uttisthata jagrata prapya barannobodhoto.*" Meaning – 'Get up, arise, get yourself charged from an enlightened soul.'

Bhakta: My Lord! I couldn't get rid of the immense desire or hunger of worldly matters. What is the way out?

Mahatma: You can't rest in the Atman unless your desires are satiated, absolute peace reigns your mind and the prarabdha karmas come to an end. The sum-total of your desire and sanskaras constitute your 'mind'. Hence while instructing, Maharshi Vasistha also said to Sri Ramchandra, – *'Mono vasana samasti*'. This proves that mind is no other entity but the collection of vasanas or desire. Introspect and see how your mind has gone through numerous vasanas in the multitude of births as human, animals, birds, insects and others and still in none of the births your desire is being annihilated. Hence, the ardent devotee Tulsidasji said –

"*Tanki bhuk tanik hai, teen pao ki ser, Manki bhuk anek hai, nigalat meru sumer.*" Meaning – the hunger of the body is very less being fulfilled by one ser of material, but the mental hunger is so much that it is not satiated by even huge materials akin to the Sumeru mountains.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(23)

Ashishda (Sri Ashish Banerjee) was a retired Bank (Canara Bank) employee then and a good kriya sadhak. Ashishda was with Guru Maharaj even before I visited Lahiri Baba and used to make it a point to visit Guru Maharaj twice daily. I knew that Ashishda would visit Guru Maharaj for at least half an hour, with a pretext of bringing drinking water from road-side tap, on several occasions before going to the bank. The idea behind such pretext was the fact that Ashishda's father was very short-tempered and imposing. He had an idea that it was a place where tantra was practised. Hence he always prohibited him from visiting Guru Maharaj. Even now, Ashishda becomes engrossed when talking about Sri Sri Baba and is mostly merged in the feelings of his thoughts. Thoughts of Baba immerses him in intense joy. Ashishda is witness to several incidents of Sri Sri Baba. Let us listen to a few of such incidents from Ashishda -

(24)

To respect man without any sense of ego – On some Sunday, myself (Ashish Banerjee), Asimda and a few of us were sitting in front of Dada (Sri Sri Baba). Dada was sitting on a cot in front of us in an engrossed mood and was talking with us. A private car came and stopped in front of his house – a fair gentleman (around 70 years old) and his driver, Motilal, stepped down from the car and came in to sit in front of Dada. The gentleman was known to Dada and he used to come to Dada off and on. Dada asked about his well being and started to talk with him. Dada noticed that the old gentleman could not sit in cross-sit position properly due to pain in his joint. He repeatedly tried to sit in a perfect cross-sit position but his foot became extended. Dada saw this and said lovingly, "Dada, try to sit in cross-sit position, I assure you that you will be successful." The old man, on encouragement from Dada, tried to bend his legs but he failed. Suddenly, Motilal spoke out with rebuff and with utter sense of disregard, "Why can't you perform this minor act? Look how I do it, try to perform it accordingly." Then the driver Motilal spread out his legs like the old man and tried to sit in a cross-sit position, but he could not bend his right leg and coil it on the other leg! Inspite of repeated efforts, he failed! It appeared that his right leg was glued to the floor by somebody. Motilal's face became red with shame. I and Asimda understood the case and looked at each other. We saw tears rolling down the cheeks of Motilal. Dada kept looking at him unperturbed and with total indifference. After a few minutes, Dada said to Motilal driver, "The identity of a true human being is to look on other humans with respect and reverence."

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

What is LIFE? – Glimpses from the Diaries of Sree Sree Maa

The diaries of Sree Sree Maa, written during her sadhana days are eternal treasures. Among other detailed notes of experiences and realizations, they contain many short English excerpts of 'word expansions' which Sree Sree Maa wrote down at various points in time. The same word has been presented in multiple expanded forms revealing deep truth in unique ways. Sree Sree Maa gave me a couple of such pieces to contemplate. We present below one such piece (in italics) called 'What is LIFE?' followed by some of my thought-notes on the same.

The original piece is as follows: *What is LIFE? – It is "Living Individually For Enlightenment" – that is, a conscious development of an individual personality to unbound the original soul from Nature's barriers not temporarily but forever. Each individual LIFE which is a unique process in the automatic system of Supreme Creation is an uncommon phenomenon in the stages of development of personalities and comprises various perceptions of consciousness in a formative structure in the screen of Mind. While marching towards greater consciousness 'LIFE' stands for "Leave 'I' For Enlightenment". When a personality attains total enlightenment, the word LIFE stands for "Love Individuals For Eternal-bliss", that is, Bhakti Yoga, leading to "Love one Individual For Existence", that is to keep one's presence and to live two-in-one.*

Here are some samples of the thoughts that emerged:-

Through Its inexplicable Will to relish the taste of Eternal Divine (Itself) in the precincts of separated existence, the Supreme created LIFE. Each instance of LIFE is seeded with the spark of the Supreme Soul, encapsulated by an ensemble of existence-consciousness and impregnated with a desire for supreme unified existence. While creation constantly expands in manifold expressions in accordance with the divine will of existential separation, every LIFE embarks on a journey for identifying, realizing, fulfilling and manifesting into permanence the desire planted in LIFE for true divine union amidst apparently separated existence. This is the divine play of the Master who has charted LIFE's destiny – actually Its own destiny – in a manner where eventual certainty and instantaneous uncertainty co-exist at every moment as two sides of the same coin, where the goal is as important as the play because the goal is met with the enactment of the play and where the absolute and the relative together ensure complete fulfilment.

The journey of LIFE towards fulfilment is a continuum, with unique variations planted in each instance of LIFE for the divine to savour Its innumerable flavours. This path can be charted into four principal universal stages (for the lack of a better word), each of which is a form of union or Yoga. The first

is the fervent attempt of LIFE to reach the seed – the spark of the Supreme Soul embedded in LIFE – and is called "Living Individually For Enlightenment". The process begins through a series of spiritual efforts (yama, niyama, asana, pranayama) that constitute an initial preparation that discipline the body, mind and vitals. The road to this spark or Atma (Individual Soul) is attained through the process of 'innergization' (pratyahara). LIFE begins to undress itself of every covering that it feels is not its Soul, thereby engaging in a process of experiencing, purifying, energizing and illuminating its subtler and subtler forms, cleaning it of the apparent 'impurities' that were acquired in its path towards separation. This is the "conscious development of an individual personality to unbound the original soul from Nature's barriers not temporarily but forever". This is a search for the inner 'I'. The search is usually ignited through the 'fire' lit up in another already enlightened LIFE (Sadguru) who has the capacity and directive to inject the power of 'discriminating insight' for the real 'I' (dharana-shakti) through the inner eye or kutastha – the screen of the Mind. One advanced LIFE catalyzes and guides another striving LIFE to persevere in its attempt to uncover itself, to purify and transform its past memories (samskaras) that flowered during the outward expansion of separate existence so that the inner eye can see the dazzling spark of the 'I'. This results in the "uncommon phenomenon in the stages of development of personalities and comprises various perceptions of consciousness in a formative structure in the screen of Mind" as LIFE undergoes the experience of seeing its own transformation. As the 'Mind's eye' engages in constant gaze with the spark of the 'Soul's I', (dharana-dhyana) it 'moves closer and closer' to submerged union (dhyana-samadhi) and eventually the screen of the Mind falls off. The six chakras are transcended by a flash of lightning descending on LIFE. What is left is the first experience of self-existence (kaivalya). The body lies listless while the Soul rejoices in Samadhi's splendid unity (kevalam). The Supreme has been touched. The joy is unfathomable. The memory is inerasable. Living Individually For Enlightenment has succeed. Nachiketa was asked to spend three days in the abode of Lord Yama for realization of Truth and gain the secret of Immortality. The first day is over. The base camp of Shiva-hood has been reached. Atma-Rama is now a part of LIFE's realized consciousness and its Supreme Divine Power (Shakti) is ready to sparkle within LIFE.

This Existence in the Soul-self with the body left out like a lifeless corpse is not the end of the journey. LIFE needs to ascend further to higher consciousness. Therefore LIFE becomes 'alive' again and the 'radiant power' (Shakti) of the Soul directly illuminates the embodied existence-consciousness. In addition to strengthening the kaivalya experience, LIFE begins to realize the conscious life-force within (prana) and its energy as an extension of the Soul. No longer is the inner subtle Being to be peeled off to realize self-existence, but LIFE now lives in harmonious existence with the Samadhi experience of the Atma and the divine living experience of the conscious vital force, realizing one to be the alter ego of the other. As the life force is everywhere, universality begins to dawn upon LIFE. Engulfing the screen of the Individual Mind (kutastha-chaitanya), the larger screen of the Universal Mind (brahman-chaitanya) appears. The coin of

the Individual Soul begins to see glimpses of its other side – the Supreme Soul. Here again innumerable experiences abound as LIFE's consciousness moves beyond the Agna Chakra towards the thousand petalled lotus (Sahasrara), realizing all the universal subtle forces as part of its existence consciousness. In the Sahasrara the individual 'I' begins to take a backseat as the aim is to merge with the universal 'I'. Therefore while "marching towards greater consciousness 'LIFE' stands for Leave 'I' For Enlightenment" – a higher and more encompassing enlightenment. LIFE begins the sadhana of unveiling the secrets of universal creation and understanding of the Ten Mahavidyas culminating in complete realization of creation and experience of oneness with the universal. The universal consciousness is an unfathomable powerhouse whose currents energize all of creation. As LIFE swims in these waters, experiencing universality with its individual 'I' eagerly seeking a larger union, current-rockets of universal consciousness overpower the individual 'I' and the coin turns. Atma realizes Paramatma – "Leave 'I' for Enlightenment" is attained. The Sahasrara is transcended. Nachiketa's second day is over. Shiva-hood's first peak is reached – LIFE is now always 'living in the oceans of Sachchidananda'. A new existence emerges where Atma-Rama, Prana-Krishna and Adya Maa become part of LIFE's realized consciousness.

There is no reason for further existence of LIFE as an individual except for the universal cause of the Supreme with which LIFE has attained self-realization. LIFE has ascended and mingled with the Supreme. But now the Supreme needs this separate existence of LIFE to fulfil its original Will of experiencing Itself in all its glory in an apparent separate existence which has all the qualities of Itself. Nachiketa needs to realize the gross existence of physical creation as divine and attain one-ness of the higher (soul), middle (subtle) and the lower (gross) levels. So now the Supreme Itself descends into LIFE and takes over direct charge of LIFE's life. The individual 'I' has already transformed into a mere observing spark that just 'feels' what the Supreme does to it. For LIFE, only emotions or bhavas prevail – with a constant urge to remain attached with the Highest Supreme Soul, Purushottam. Now the Supreme through its power (Adya Maa) reigns and transforms the gross elements of LIFE into divinity. LIFE remains completely attached to the Supreme through the power of bhavas. Bhakti Yoga sets in and LIFE having become Param Shiva reaches the gates of Goloka in the emotions of Shanta Bhava. Here Shiva sees Its Purushottam form in his eternal divine appearance (Sri Krishna) and the image of Maa Adya-Shakti turns to reveal her divine form of Love as Shrimati Radharani. Now sadhana transforms from realization through penance to surrender through dilution (laya) and service. As LIFE undergoes various emotional attachments of companionship, dilution through mingling and service with Purushottam Sri Krishna and Srimati Radharani through Dasya (Service), Vatsalya (Parental), Sakhya (Friendship), Kanta (Lover), the Supreme transforms each remaining element of LIFE encompassing its most transcendent to its most gross existence consciousness, permeating it with parasamvit – unified divine existence consciousness. All existence of LIFE mingles into the Supreme Being and transforms itself to a Being of Love – Prema-Bhava manifests. LIFE looks at all

other LIFE as another embodiment of its Supreme Lord and thus "when personality attains total enlightenment, the word LIFE stands for 'Love Individuals For Eternal-bliss', that is, Bhakti Yoga". Nachiketa completes his third day and attains the secrets to true Immortality. LIFE as Param Shiva enters Goloka, rubs Itself in the sacred soil of the eternal divine world, becomes a Gopi and begins to take part in Radha-Krishna's Raasa dance. This is the dance that propels and sustains all existence and fulfils the original Will of the Supreme to experience Itself in all its glory. LIFE now becomes one with the Supreme's Will and attains the 'golden embodiment' of Bhagwat Sajujya or Divine Akin-ness – the individual 'I' is now regained but is in resonating unity with the universal 'I' – none knows the difference except those of the same kind.

The Supreme has not yet had Its fill. Now that LIFE has realized the entirety of existence, it is now ready to receive the greatest gift that the Supreme can give to a Soul – the spark of Radharani as Its partner. LIFE-Shiva receives LIFE-Parvati (who is also Sati, Durga, etc) for eternity. She either emanates from the Being of LIFE-Shiva and illuminated by Srimati Radha or is another LIFE who has directly descended through the Will and from the light of Radharani and in both cases, undergoes similar transformation as LIFE-Shiva to enable them to perform sadhana together in harmonious union. The two LIFE-partners perform a unique Yoga of Madhurya or Eternal Divine Love to attain divine alike-ness or Sarupya with the Supreme Dual. LIFE is now a conjoined Bhagwan-Bhagwati combine – having attained Krishna-Radha-hood to express and experience the ultimate emotion of 'Madhur Bhava'. One's existence is the other's consciousness and vice versa "leading to 'Love one Individual For Existence', that is to keep one's presence and to live two-in-one". They are now capable of re-creating their own mandala and their raasa, which swings in tandem with Radha-Krishna's raasa. Due to their unique one-in-two and two-in-one forms they become capable of universal (or samasthi) sadhana – that is performing the same leela-sadhana of the Universal Soul in all realms of exisence taking various Rishi, Daiva and Manava avatars. Now the Supreme sees Itself, savours Itself in a separate alike existence of the eternal dual. LIFE has reached its pinnacle, where this Supreme form of LIFE-Dual can now do to other LIFE forms what the Supreme did to it – make another like Itself.

Sri Aurobindo said "All LIFE is Yoga". It is the Supreme's natural frequency which It goes on repeating, in infinitely unique ways. The above was just one way of reliving the various word expansions of LIFE as written down by Sree Sree Maa. Every major scripture like the Yogasutras of Patanjali, Bhagwad Gita, Guru Gita, the Upanishads, Brahma Sutras, Siva Sutras, Shrimad Bhagwat, Chaitanya Charitamrita, etc., presents some or all of LIFE's journey in their own style and flavour, in tune with the Supreme's Will to relish Itself in many ways. It is possible to reveal the same word expansions of LIFE using the sacred texts. May each one of us to look at our own LIFE through our own eyes so that the deep emotions that emerge from every 'I's such attempt is offered to the Supreme in loving reverence and the bliss is shared with all as prasad.

–her Blessed Child

Prof. Partha Pratim Chakrabarti

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(18)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

The Divine Consciousness (*Chaitanya*) blended with intellect (*buddhi*) resides within the kernel of the heart lotus (*hrid-padma*). Due to its combination with intellect, *chaitanya* is differentiated from the pure absolute consciousness and is referred to as intuitive-consciousness (*abhas-chaitanya*), the reflected consciousness (*chit-pratibimba*) or the perceptive impression of consciousness (*chidabhas*). This intellect mingled reflection of consciousness induces sensate dynamism (*sachetana kriyashalini*) into inert-intellect (*jara-buddhi*) and transforms it into the fundamental aspects or elements of perception, namely *rup* (form), *rasa* (flavor), *gandha* (odour), *sparsha* (touch) and *shabda* (sound). However, *chit-pratibimba* cannot provide objective knowledge (*vastu-gyan*) because the principle of intellect as such is devoid of the aspect of observation (thus distinguishing *buddhi* from *Drashta*). It is only when Pure Consciousness (*Atma* or *Kshetragya Purusha*) observes the activity or occupation of the intellect that objective knowledge is obtained. *Abhas-chaitanya* only makes the intellect active towards different tendential aspects (*rup*, *rasa*, *shabda*, *sparsha* and *gandha*); it cannot transform this intellect into an observer and the perceiver of knowledge. It is through the *Kshetragya Purusha's* absolute eternal observation of this active-intellect (*buddhi-vritti*) that knowledge is produced.

The ordinary *jiva* may be considered to be the outcome of this blend of intellect with *chit-pratibimba*, the reflected consciousness. *Kshetragya Purusha* is the actual spiritual *Jiva*. When intellect is cleansed of its tendential traits through penance, *Kshetragya Purusha* emerges in its full glory and splendor; the *jiva* attains self-realization. Mingled with tendential traits, consciousness virtually takes the form of the traits themselves. The intellect which is within the realm of the three fundamental mental traits is subject to cause, effect and transformation, while *Kshetragya Purusha,* the pure consciousness remains eternally changeless. The *jiva* would be devoid of all knowledge if *Kshetragya Purusha* did not observe the intellect's tendential traits.

In the absence of knowledge, the body (*deha*), mediums of perception (*indriyas*), mind (*man*) and intellect (*buddhi*) would all be inert and inactive. This is why *Kshetragya Purusha* has been referred to as the spiritual or psychic being. The Universal Consciousness, *Brahman*, takes the *jiva's* embodiment through his own Will. Veiled within the cloud of ignorance, the *jiva* does not realize that the seed of his own existence, *Atma*, is actually the Supreme undivided Consciousness, *Brahman*. *Brahmic*-consciousness is all-pervading, existing everywhere within the entire world of the animate and inanimate. *Brahmic*-consciousness pervades within the absolute entirety of the *jiva*, from the nails to the strands of his hair. Although, the *Brahmic*-consciousness and *Atma* or *Kshetragya Purusha* are not different, it seems as if a separate *Kshetragya Purusha* is resident within each distinct embodiment of the *jiva*. The *Atma* is referred to as the *Kshetragya Purusha* (literally meaing, *the knower of the embodiment*) because He acts as the observer of individualistic intellectual traits

(*buddhi-vrittis*). The thirteenth chapter of the Bhagwad Gita says, "*Kshetra-gyanam-chapi mang vidhi sarva-ksetresu bharata*." Meaning – The One Undivided all pervading *Brahmic*-consciousness is manifest in every *jiva*; although, it apparently seems to be divided into multiple units, it is the One and same consciousness that is reflected as distinct *Kshetragya Purushas* in the individual *jivas*. Here, *mang* refers to the Universal Consciousness, *Paramatma*. You will be able to understand all this if you learn the entire chapter.

The living entity (*jiva*) is comprised of the physical body (*deha*), mind (*man*), intellect (*buddhi*), mediums of perception (*indriya*), awareness of dynamic intellect-blended existence (*sambit*), intuitive consciousness (*abhas-chaitanya*) and Pure Consciousness (*Kshetragya Purusha*). *Kshetragya Purusha* is the origin and cause that results in the *jiva's* experience of happiness, grief etc. as the fruits of his actions (*bhoga*). Hence, He is referred to as the enjoyer of the fruits of actions (*Bhokta*). However, neither can *Kshetragya Purusha* alone (in isolation), nor can *abhas-chaitanya* (along with the body, mind, intellect and mediums of perception) in seclusion (separated from the *Kshetragya Purusha*) be considered to be the cause of the *jiva's bhoga*. Rather, the experience of the fruits of actions is effected through the conjugate unison of the *Kshetragya Purusha* and *abhas-chaitanya*.

The *shruti* has emphasized that *Brahman*, the Pure Consciousness is the original and essential manifestation of the *jiva*. While advising Swetaketu about the knowledge of the *Brahman*, his father said, "*swoyahang*"; meaning— I am That (*Brahman*), "*tat-twam-asi*"; meaning— You are That (*Brahman*). Here '*tat*' or 'that' refers to the all-pervading Universal Brahmic-consciousness and '*twam*' or 'you' denotes individualistic embodied consciousness. These words attempt to underline that the Universal and individualistic consciousness are one and the same. As knowledge blossoms through meditative penance, the *jiva* understands that the essential self is an expression of Universal Consciousness and whatever is externally beheld and perceived are but manifestations of the *Paramatma*. To know the *Brahman* is what comprises the *jiva's* knowledge and not knowing the *Brahman* is his ignorance or bondage. Through the revelation of knowledge, *jiva* liberates himself from the cycle of births and deaths and do not transcend to any specific heavenly abode (*loka*) after departing from the mortal coil. In the last verse of the second chapter of the *Uttara Gita*, Sri Krishna tells Arjuna, "*Nahang Brahmeti Janati, tasya muktirna vidyate*." Meaning – There is no liberation for the person who does not realize himself as the expression of *Brahman*. Similar statements may be found in almost all scriptures of the *shruti*.

Knowledge of *Brahman* is natural. The intellect in its pure form is oriented towards exposition (*satwagunatmika*) and gets degraded through the impurities of the *rajah* (the distracting tendency) and *tamah* (the delusive tendency) *gunas* (potentialities of the mental traits). The *Brahmic*-nature spontaneously reveals itself when the mind is cleansed of its *rajasiki* (distracting) and *tamasiki* (delusive) impurities. The *jiva* is then able to comprehend that his essential self is distinct and separate from the intellect.

...to be continued

—her blessed child, **Sri Arnab Sarkar**

My Life With Anirvan

Part - XXVII

Om *Haimavati, Shillong*
17.5.64

My dear Gautam,

Your inland letter of the 9th. Here is the weekly weather report for Shillong and Anirvan.

Shillong: Almost always cloudy with spells of sunshine! Heavy showers almost everyday. The overall impression: Nasty.

Anirvan: Much better this week. The urine trouble continues but is now much lessened. Appetite good. Energy – three quarters full. Strength gaining slowly. Sometime there is a sudden crash. But the reason there of lies elsewhere[1]. It has puzzled the doctor, but mother knows. In any way it is not alarming.

I have consulted Dr. Guha about the suggestions of Dr. Ghosh. He said, he had used alkasol at the very beginning and it is not necessary now. The germs were of peculiar type which Pasteur test showed to be wholly insensitive to mycin drugs. Auto-vaccine is simply by way of precaution. To strenghten the urinary system and hence lessen the obstruction he has started today a bi-weekly course of hormone injection. Pyridine tablets have been very helpful. I shall be on my legs again in another two weeks.

I don't regret this forced holiday. Every seven or eight years, I used to go into solitude to tone up the system. This has long been overdue. I have not taken any rest for the last fifteen years. This enforcement has made me much richer in experience. Suffering is absolutely necessary to make the cup of spiritual life full. If work stops in one plane, it goes on with intensified vigor on other planes.

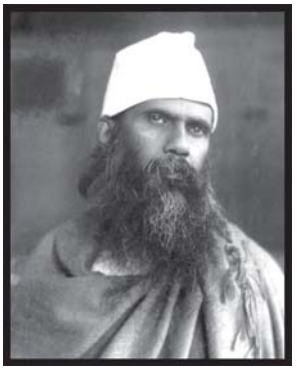
Sri Anirvan

I had asked you to see if the Vols- I and II of Prof. Eggilings translation of the Satapatha Brahmana in the sacred books of the East series, are sold separately by the publishers of the reprint Motilal Banarasidass.

Hope you are all ok. My love to you all...
Ever yours ... A

During this time (April-May 1964), apart from Bcoli infection, acute prostrate problem had also developed. Anirvanji also sufferred from Hernia, which he controlled by Pranayama. Next week came another letter discussing in detail about the transfer of Haimavati to Calcutta.

Om *Haimavati, Shillong*
24.5.64

My dear Gautam,

Your letter of the 20th. I hope you are quite alright now. I slept well last night and the pain of urination was almost nil. I think, I have turned round the corner!

Narayani of Puri is expected to come to Mr. Chatterjee's place by 29th of this month. If she comes, will you please pay her Rs. 40/- which I left with you, telling her that this is towards four months' remittance beginning from June?

I have given careful thought to your suggestion. I am not willing to leave

[1] Psychological and spiritual. Anirvanji had suffered similar serious illness in the thirties when Snehalata had left him from the Umachal Ashram near Gauhati. In Vaishnava parlance this is called "Vipralambha" – pain of separation from the lover. Radha and Chaitanya are the famous examples of this state of "Vipralambha." Anirvan has also discussed the this state in many letters.

Shillong even before October. But I am afraid this will not be possible before the treatment closes and I have a complete rest for a few weeks. The date for the last injection is the 6th of June. After that I feel, I must let the whole of the month of June expire, allowing me a complete rest from all work. At present, it is physically impossible for me to put myself to any stress in travel either by rail or by air. Even if you or Sharad come to help me in packing up, I have to direct you personally because you will not know, what to take or what to leave. This I cannot do now. My position is this. The body is quickly gaining strength; the spirit is free and firm and can soar to heights; but the mind is in a stage of coma and revolt at the very idea of any strain. I think, this is because, I did not give it any rest for the last fifteen years. And a holiday of at least three months was overdue seven or eight years back. So I must give it complete rest for a few weeks. Then, the climate of Shillong is ideally suitable for convalescence. Calcutta will be too hot and strain me physically. And moreover, the bustle of Calcutta life cannot be avoided by any means. But what I need now is this calm and quiet of Haimavati. So I think, you will allow me to rest here for a few weeks and when I fell myself quite fit, I will give the signal to strike tents. In the meanwhile you can go for your much needed spiritual retreat. At the end of all, we begin our new life? Am I right?

Yes, I was drifting. It is natural for the "will to live" to fight suffering and death. But when suffering opens the gates to new wonders and Universalized Consciousness finds it linked with the cosmic movement, individual will disappears in Her will – Her will to achieve Victory through crucifixion. You have to drift then, whether it leads you to life or death. Any how the experience has been marvelous.

Hope you are all ok. My love to you all...
Ever yours … A

Let us close this note book here. We will open the next book with Anirvanji's next letter from Shillong dated 1st June 64, wherein he says, "After a month and a half, I am today celebrating a New Year Day or a New Birthday ... leaving my sickbed and writing this letter to you sitting on my chair before the secretariat table and facing the lovely figure of Haimavati Mahishmardini[2]."

Om *Haimavati, Shillong*
1.6.64

My dear Gautam,

Your letter of the 28th. After an month and a half. I am today celebrating a New Year's day or a New Birthday (whichever you prefer to call it) by dismissing my faithful and patient nurse Prof Panigrahi, leaving my sickbed and writing this letter to you sitting on my chair before the secretariat table and facing the lovely figure of Haimavati Mahisha-mardini. You may say, I am almost normal except some weakness still lingering. The course of injection will be continued by the doctor till July 18! I am spending June doing nothing and enjoying my well earned rest.

This illness – the worst in my life – seems to me to be a God-send. It is really an opening up of a new vista. And your idea of visiting Amarnath perfectly coincides with my inner feelings. May you have the vision of the Lord of Immortality who will guide you to your goal which he has fixed up for you.

Mono has come with the Badi – thank you. Himangshu Babu[3] will be coming

[2] "mahismardini" – The destroyer of the demon Mahishasura. This picture photo of Durga – painted by Sri Promod Kumar Chattopadhyay which Anirvanji kept by the side of his writing table.

[3] Himangshu Niyogi – President of Sri Aurobindo Path Mandir in Calcutta, as well as in Shillong. Anirvanji's Haimavati was situated in the sprawling compound of the Shillong Path Mandir.

tomorrow. I shall send back with him the time-pice (Europa) which stopped during my illness – may be due to mishandling. You need not send it back.

It seems Haimavati is going to establish Herself at Hridaypur! She will make a really fine choice, I think. Go on with the plan (or the dream) as She guides you all. I have not much to suggest. Only, I can say this much, a house facing south and on the bank of the tank will be lovely. In Bengal, we say "a home facing south is the king of all houses," because it gives you warmth in the winter and shade in summer. I require a small bedroom, say 12 feet by 8 feet, a study say 12'x12', a kitchen and store combined say 12'x6' and a small bathroom. A verandah will be fine. Another cottage for guests – a tiny one, well and good. Perhaps this is your idea too? Only I want to have bedroom at the eastern end of the cottage, so every morning I may have a vision of Devah Savita rising.

Here, I shall be in full rest through out June. In July I shall take up some light work such as revision of lectures on Upanishad etc. and work at half speed. In August I mean to take up Veda-mimamsa again and see how far I can go in two months. From the beginning of October, I begin to select and arrange things, preliminary to the "Great Departure". If by December our "Hridaypur" is not ready to receive Haimavati, well she may be installed at Keyatala!

After the death of Nehru, somehow, I feel a new India is going to emerge, even if there is some turmoil. People had been hoodwinked too long by hero worship. It is time their eyes open.

Hope you are all ok. My love to you all...

Ever yours … A

To another devotee Anirvanji writes from Shillong on 30.5.64.

"I am much better now. But I will have to take a long rest. I have laboured without taking any rest for the last fifteen years – now I will take rest for about two months...

I am and will remain better. After the Puja I will wind up the work here and wish to go to Calcutta. Work there will be more facilitated. I will live in Calcutta, as I am here as living in a cave – within myself and if you are fully engrossed in your work nothing will touch you – you know that. Therefore, don't worry. Love and blessings – Anirvan." – Patralekha Vol V, p. 29.

After the passing away of Bandhu Dharmapal in August 1955, I used to go for spiritual retreats for a month or more, especially when Sharad Dharmapal will be in Calcutta. This time Anirvanji had suggested Poona, Swami Amarjyoti's Ashram, where we had been for a few days in January 1963. But one night I saw a dream, that I am walking with a party of pilgrims going to cave of Amarnath in Kashmir, shouting "Baba Amarnathji ki jay" and therefore taking it as Divine will, I decided to go to Amarnath and wrote accordingly to Anirvanji, which he too acclaimed! As seen in the previous letter.

Though Anirvanji never actively participated in politics or the struggle for freedom from the British Rule, he was always sympathetic towards truly nationalist movement and encouraged those who worked and sacrificed for the country and always wished for the emergence of better and greater India. Like Swami Vivekananda and Sri Aurobindo, he too had his dream of great and glorious India, And therefore in his letters to me, he always opined about the present political situation, as I was more actively connected with Freedom Movement in my young age and always took active interest in politics.

-Sri Gautam Dharmapal

News in Brief

11-22nd January: The renowned saint of Pushkar SriSri Tatbaba spent these days in Akhanda Mahapeeth Ashram. The disciples and residents of the Ashram consider themselves fortunate to be able to serve a saint like him.

15th January: The 8th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted with full majesty. Puja of the Guru Maharajas was conducted in the morning by Sri Yagna Narayanda followed by yajna and offering of prasad. Like every year, some students of Hotor Ashram were present on this day. Swami Gurudas Ashramji and Swami Sanvedanandaji presented gifts to the students of our Hotor Ashram. In the evening, a cultural session was organized where an enchanting musical programme on regional dances was presented by the students of Hotor Ashram. After that, another mesmerising dance program was conducted by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak. The previous issue of Hiranyagarbha was also released. The cooking of the sacred offering (bhog) and its distribution among all the devotees was another very important aspect of the ceremony.

7th February: On this evening Sri Subrata Sengupta presented Rabindra Sangeet in presence of Sree Sree Maa.

12th-15th February: Sree Sree Maa visited Ashram at Puri with some of her disciples. During her stay she had visited Shiddheswari Temple, Adwaita Brahma Ashram and the Temple of Panchalingeswar. On 13th February, Sree Sree Maa delivered a speech at Divine Life Society, arranged by Sri Jitomahanandaji, Mohanta of the society at Baligowali.

19th February: Swami Suddhanandaji, Mohanta of Yogoda Satsang Society visited Akhanda Mahapeeth to meet Sree Sree Maa. The disciples present enjoyed the evening in satsang.

23rd February: Sri Imtiaz Ali, a saint disciple of Sree Sree Maa visited the Ashram in the evening. He met Sree Sree Maa and spent some time in discussion.

28th February: Sree Sree Maa alongwith some Ashramites visited 'Hotor Ashram'. Sadhvi Suchetanandamoyee and Sadhvi Punyanandamoyee welcomed Sree Sree Maa through arati and garlanding. The students and brahmacharinis of the ashram also paid their heartiest homage to Sree Sree Maa. Sree Sree Maa inspected the residential complex of the students and distributed chocolates among the children. Some villagers also came to meet Sree Sree Maa and paid their homage. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme. After having prasad, they all returned back.

7th March: On the auspicious occasion of 'Shivaratri' Sree Sree Maa performed puja of Lord Shiva at night in personal solitude. Thereafter, Guru brother Sri Yagna Narayanda performed yagna.

20th March: The eighteenth 'Adhyatmik Sabha' was organised. Our brother disciple Dr. Barun Dutta presented a discourse on 'Ishopanishad and Kenopanishad'.

23rd March: Prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the Ashram premises and 'dol-purnima' was celebrated through a cultural evening where the dance drama 'Chitrangada' written by Sri Rabindra Nath Tagore was performed by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak after two dance recitals by the junior artists Ashoka Basu and Sraddha Dasgupta.

25th March: A large gathering of devotees and disciples was held at guru-brother Sri Rajendra Sethia's residence due to visit of Sree Sree Maa at the place. The evening was spent heartily amongst songs and satsang. The visitors enjoyed the prasad at the end.

Forthcoming Events

Buddha Purnima: 21st May, Saturday
Spiritual Congregation: 19th June, Sunday
Guru Purnima: 26th July, Tuesday

Statement about ownership and other particulars about HIRANYAGARBHA to be published in the first issue every year after the last day of february.

1. Place of publication : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

2. Periodicity of Publication : Quarterly

3. Printer's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

4. Publisher's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

5. Editor's Name : Sri Arnab Sarkar
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
: Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

I, Dr. Barun Dutta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledege and belief.

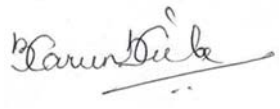

Date: 15th April, 2016 Signature of the Publisher

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....